ব্রজবিদেহী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রী১০৮ স্বামী ধনঞ্জয়দাস আচার্য্য বাবাজী মহারাজ
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্বামী সত্যদাস নিম্বার্ক বৈষ্ণব সাহিত্য মুখপত্র

বাসুদেব

"ভূতেষু বসতে সোঽন্তর্বসন্ত্যত্র চ তানি যৎ
ধাতা বিধাতা জগতাং বাসুদেবস্ততঃ প্রভুঃ ॥"

সম্পাদক—
ডক্টর অমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য,
এম্.এ., পি.এইচ্.ডি., বেদান্তশাস্ত্রী,
কাব্য-মেদান্তবেদান্ত-তীর্থ

যুগ্মসম্পাদক—
শ্রীসুব্রত সেনগুপ্ত এম্. এ.
শ্রীললিত কুমার বসু বি. এ.

১৩৮১ বঙ্গাব্দ ● শ্রাবণ-ভাদ্র ● ৫ম সংখ্যা ● ৪র্থ বর্ষ

সূচীপত্র

মঙ্গলাচরণ

সম্পাদকীয় ১৩৪

শ্রীমৎ ধনঞ্জয়দাসজীকে যেমন দেখিয়াছিলাম—শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ— ১৭৬

শ্রীনিম্বার্কীয় ধর্মগুরু শ্রীশ্রীভট্টাচার্যজী মহারাজ —শ্রী১০৮ স্বামী ধনঞ্জয়দাসজী কাঠিয়া বাবা ১৩৭

অনুভবাণী (সংকলন)—

শ্রীসৌম্যদেব চট্টোপাধ্যায়

মনের কথা—শ্রীব্রত সেনগুপ্ত

তের ভাকেন তুলীখাঃ— শ্রীধর্মদাস দাস

হরিদ্বার কুম্ভমেলায় যখন যাচ্ছিলাম—

শ্রীদেবেন্দ্র কুমার পাল চৌধুরী ১৪৮

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ কি গুণগত অথবা গুণকর্মগত- ডঃ অমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য)

আমি আমার (কবিতা)—শ্রীঅজিতকুমার দে

পাশ্চাত্য সভ্যতা বনাম প্রাচ্য সভ্যতা— ব্রহ্মচারিণী শ্রীকল্যাণী দেবী

গ্রন্থপরিচিতি ও সমালোচনা

নিম্বার্ক উৎসব নির্ণয়

সাময়িকী

জীবনদর্পণ

গ্রন্থকার—শ্রীললিতকুমার বসু

মূল্য—চার টাকা

শ্রী১০৮ স্বামী ধনঞ্জয়দাসজী কাঠিয়া বাবা ও তাঁহার গুরুদেব শ্রী১০৮ স্বামী সন্তদাসজী কাঠিয়া বাবার মধ্যে যে সকল পত্রের আদান-প্রদান হইয়াছিল এবং যেগুলি একত্রে পাঠ করিলে অপূর্ব্ব গুরুশিষ্য-সংবাদ পাওয়া যায়, সেই সকল পত্রাবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ইহা শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের সাধন-জীবনের একটি অকৃত্রিম প্রতিবিম্ব যাহা গুরুশিষ্যের পত্ররূপ দর্পণে প্রতিফলিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে প্রদত্ত, পূর্ব্বে গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত, শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের কল্যাণকর উপদেশামৃত গ্রন্থের গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে। এই গ্রন্থ সদ্‌গুরুর আশ্রিত সকল কল্যাণকামী সাধকের সাধনজীবনের পথ-প্রদর্শক ও সহায়ক হইবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীবাসুদেব

১৭ বর্ষ
৫ম
সংখ্যা

মঙ্গলাচরণ

নমঃ পঙ্কজনাভায় ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়াত্মনে
বাসুদেবায় শান্তায় কূটস্থায় স্বরোচিষে ॥

ভাগঃ ৪ ২৪ ৩৪

—হে ভগবন্! লোকসমূহের কারণ পদ্ম আপনার নাভি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে অর্থাৎ আপনি সকলের কারণ এবং আপনি স্থূলভূত সূক্ষ্মতন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়সমূহের নিয়ন্তা, সেই শান্ত, স্বপ্রকাশ ও নির্বিকার-স্বরূপ চিত্তের অধিষ্ঠাতা বাসুদেব আপনাকে নমস্কার করি।

সম্পাদকীয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব বলিতেন—"তোরা বিড়াল-ছানা হয়ে থাক, বানর ছানা হবি না"—অর্থাৎ বিড়ালছানা যেরূপ সর্ব্বাবস্থায় তাহার মাতার উপরই নির্ভর করিয়া পড়িয়া থাকে, তাহার মাতা তাহাকে মুখে করিয়া লইয়া গিয়া যখন যেখানে রাখে তখন সেখানেই সেই অবস্থাতেই বিড়ালছানা থাকে, সেইরূপ সাধকও সাধনাদি সর্ব্বাবস্থায় শ্রীভগবানের উপর সর্ব্বতোভাবে আত্ম-নির্ভর করিয়া ও শরণাগত হইয়া থাকিবেন। নিজের স্বাতন্ত্র্যাভিমান ও স্বতন্ত্র ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া সর্ব্ববিষয়ে ভগবদিচ্ছাই সন্তুষ্টচিত্তে বরণ করিয়া চলিবেন। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে, জয়-পরাজয়ে, লাভ-ক্ষতিতে, মানাপমানে সর্ব্বাবস্থাতেই সকলই ভগবৎপ্রেরিত জানিয়া সন্তুষ্টচিত্তে শ্রীভগবানেই আত্মসমর্পণ করিয়া চলিবেন। এইরূপ করিলেই ভগবৎকৃপায় পরম শান্তিলাভ তিনি অচিরেই করিবেন। সাধন জগতে এইরূপ সমর্পণের ভাবটিকে বলা হয় "মার্জ্জার ন্যায়"।

আর একটি ভাব আছে "মর্কট ন্যায়" শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় "বানরছানার ভাব" অর্থাৎ বানরছানা নিজেই তাহার বানরী মাতাকে জড়াইয়া ধরিয়া থাকে, তাহার মাতা কিন্তু তাহাকে ধরিয়া থাকে না। সেই অবস্থায় বানরী মাতা যখন একগাছ হইতে অন্যগাছে লাফাইয়া যায়, তখন অনেক সময় তাহার শাবকটির শিথিল হস্তপদ স্খলিত হইয়া পড়ে এবং সে তাহার শরীর রক্ষা অবস্থা হইতে চ্যুত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়া আহত বা নিহত হয়। সেইরূপ সাধকও স্বীয় স্বাতন্ত্র্যাভিমান, অহং ও পুরুষকার অবলম্বন করিয়া সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কখনও কখনও সাধন হইতে চ্যুত হইয়াও পড়িতে পারে। কারণ বানরছানার তাহার মাতাকে ধরিবার ন্যায় সাধক স্বয়ংই নিজচেষ্টায় ভগবানকে ধরিতে চেষ্টা করে এবং ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণের অভাবে তাহার পুরুষকারও অনেক সময় ব্যর্থ হইয়া যায়। এই কথার তাৎপর্য্য এই যে পুরুষকার অপেক্ষা আত্মসমর্পণই নিরাপদ রাস্তা। শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া চলিলে তিনি স্বয়ংই সাধকের হাত ধরিয়া লইয়া যান, সাধকের আর পতনের ভয় থাকে না। ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—

"যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥"
১২। ৬-৭

—"আমাতে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করিয়া আমাকে একমাত্র আশ্রয় জানিয়া অপর সমুদায় চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক একাগ্র-চিত্তে ধ্যানাবলম্বনে যাহারা আমার উপাসনা করেন, আমাতে নিবিষ্টচিত্ত ঐসকল ভক্তকে আমি স্বয়ংই মৃত্যুরূপ সংসারসাগর হইতে শীঘ্র উদ্ধার করিয়া থাকি।"

আবার শরণাগতিরূপ সাধনের কথা বলিতে গিয়াও ভগবান বলিয়াছেন—

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥"
১৮। ৬২

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥"
"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" ৬৬

—অর্থাৎ, হে ভারত! তুমি সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হও। তাঁহার প্রসাদে তুমি পরম শান্তি এবং শাশ্বতধাম প্রাপ্ত হইবে। ৬২। তোমার মন আমাতে অর্পণ কর, আমাতে ভক্তিযুক্ত হইয়া আমার ভজনে নিযুক্ত হও, আমার নিমিত্ত যজ্ঞাদিক্রিয়াসকল সম্পাদন কর এবং আমাকে নমস্কার (আত্মসমর্পণ) কর। এইরূপ করিলে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে—এই সত্যবাক্য আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া তোমাকে বলিতেছি, কারণ তুমি আমার প্রিয়। (৬৫)।

সকলপ্রকার ধর্মাধর্মবিষয়ে বিচার তুমি পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণ গ্রহণ কর। (অর্থাৎ আমি যেরূপ বলি নির্বিচারে তদ্রূপ আচরণ কর) তাহা হইলে আমি তোমাকে সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত করিব, তুমি আর শোক করিও না" ।৬৬।

এখানে অনেকের মনে সংশয় উঠিতে পারে যে—তবে কি পুরুষকার অবলম্বন করিয়া সাধনাদি করিবার কোনই প্রয়োজন নাই? কেবলমাত্র আত্মসমর্পণ করিয়া বসিয়া থাকিলেই চলিবে? বিনাসাধনে কি কিছু লাভ হইতে পারে? বিষয়টি আলোচনার যোগ্য।

উপরে দুইটি পথের কথা বা দুইটি ভাবের কথা বলা হইয়াছে—প্রথমটি মার্জারী ন্যায়"—বিড়ালছানার মত আত্মসমর্পণের ভাব নিয়ে থাকা, আর দ্বিতীয়টি "মর্কটন্যায়" বানরছানার মত স্বীয় পুরুষকার অবলম্বনে সাধন চেষ্টা। যাহার "আমি কর্তা"—এই অভিমান রহিয়াছে, তাহার সকল কার্যেই পুরুষকার আবশ্যক। যতক্ষণ স্বতন্ত্র অহং-বুদ্ধি আছে, বুদ্ধির পরিচালনা আছে, ততক্ষণ কর্মও আছে। সুতরাং এইরূপ কর্তৃত্বাভিমানযুক্ত সাধক স্বীয় পুরুষকার অবলম্বনেই সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন। এইরূপ সাধককে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান বলিয়াছেন—

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।" ৬।৫

নিজের চেষ্টায় যাহাই নিজেকে উদ্ধার করিবে। নিজ আত্মাকে (অর্থাৎ মনবুদ্ধিকে) অবসাদগ্রস্ত করা উচিত নহে। কারণ আত্মাই (মনবুদ্ধি) আত্মার বন্ধু, আত্মাই (মনবুদ্ধি) আত্মার শত্রু।

সংসারের সকল কাজই যখন অহংবুদ্ধির পরিচালনা করিয়া পুরুষকার অবলম্বনে করিতেছি, তখন কেবল ভগবদ ভজনের সময় ভগবৎ কৃপা ও আত্মসমর্পণের দোহাই দিয়া আলস্য করিয়া বসিয়া থাকা আত্মপ্রতারণা মাত্র। সুতরাং যতক্ষণ অহংবুদ্ধি আছে, ভালমন্দ কর্মবিচার আছে, 'আমি কর্তা' বলিয়া বোধ আছে, ততক্ষণ কর্মের প্রাধান্য স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং স্বীয় পুরুষকার ও ইচ্ছাশক্তি অবলম্বন করিয়া সাধনও করিতে হইবে।

আর সেই পরম পিতা পরমেশ্বরে যাঁহার আত্মবিন্যাস হয় গিয়াছে, একমাত্র সেই ব্যক্তিই সেই মহানিয়তির অধীন থাকিতে পারে। "জগৎটা সেই পরম পিতার ইচ্ছার সুচারুরূপে নিয়মিত এবং তিনি যে অবস্থায় আমাকে রাখিবেন তাহাই আমি আনন্দে বরণ করিব। আমার স্বতন্ত্র কোন সঙ্কল্প বিকল্প থাকিবে না"—এইরূপ যাঁর স্বতন্ত্র সঙ্কল্প স্বতন্ত্র আমিত্ববোধ যাহার নষ্ট হইয়াছে একমাত্র তিনিই শ্রীভগবচ্চরণে পরিপূর্ণ সমর্পণ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন। অপরের পক্ষে তাহা সাধ্যাতীত।

আরও একটি কথা—আত্মসমর্পণের পথেও সাধনার অবকাশ আছে। শ্রীভগবানের অনুকূলের গ্রহণ, প্রতি-কূলের বর্জন, বন্দনা, গোপ্তৃত্ববরণ বা প্রার্থনা, তাঁহার রক্ষকত্বে দৃঢ় বিশ্বাস, ধৈর্য প্রভৃতি শরণাগতিধর্মের অনুশীলন করা, ও তৎসম্বন্ধীয় শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-বন্দনাদি সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করা আত্মসমর্পণের পথের সাধকেরও কর্তব্যরূপে বিহিত হইয়াছে। সুতরাং কর্মত্যাগ বা সাধনরহিত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা সাধকাবস্থায় অভিপ্রেত নহে, বা তাহা শাস্ত্রবিহিতও নহে। অতএব কোন অবস্থাতেই একেবারে কর্মত্যাগের প্রশ্নই আসে না। সিদ্ধ মহাপুরুষদেরও শরীর ধারণের জন্য কর্ম করিতে হয়। চুপ করিয়া বসিয়া থাকাও একপ্রকার কর্ম, এমনকি নিদ্রিত থাকাও কর্ম। কারণ তাহাতেও শক্তিক্ষয় হয়। ইচ্ছা করিলে কেহ দীর্ঘকাল পর্যন্ত বসিয়া থাকিতে বা ঘুমাইতে পারে না। শুদ্ধের ক্রিয়া সেই অবস্থাতেও হইতে থাকে। সিদ্ধতত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষগণও সকল কর্মই করেন, কিন্তু তাঁহাদের বুদ্ধি সেই সেই কর্মে লিপ্ত হয় না। তাঁহাদের অহংকর্তৃত্ববুদ্ধি নষ্ট হওয়ায় তাঁহারা সকল কর্মেই নির্লিপ্ত থাকেন। এই কথাই ভগবান "নৈব-কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ"...ইত্যাদি শ্লোকে (গীতা ৫।৮-১০) বলিয়াছেন। সুতরাং একান্ত কর্মরহিত অবস্থা কখনও সম্ভব নহে। 'বিড়ালছানাও 'মিউ মিউ' করিয়া তাহার মাকে ডাকে। সুতরাং আত্মসমর্পণের পথের সাধকের পক্ষেও কর্ম রহিয়াছে। তাহার সেই কর্ম হইল আত্মসমর্পণেরই সাধক। সুতরাং সাধক তাহার পুরুষকার ও প্রবল শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করিবার জন্যই প্রয়োগ

করিবেন। শ্রীভগবানের ও আত্মস্বরূপের স্মরণ-মনন-নিদিধ্যাসনরূপ কর্ম সাধনার সকল পথেই রহিয়াছে। এমন কি ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষগণও শ্রীভগবৎস্মরণ মনন রূপ কর্ম লইয়াই থাকেন। তাঁহারাও নিষ্কর্মা থাকেন না। সাধীরিক কর্ম বাদ দিলেও মানসিক তত্ত্বচিন্তনরূপ কর্মসকলেরই সকলবস্থাতেই থাকে। অতএব সাধনত্যাগ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকার প্রশ্নই উঠে না।

শ্রীমৎ ধনঞ্জয়দাসকে যেমন দেখেছিলাম

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

শ্রীমৎ সন্তদাস বাবাজী মধ্যে মধ্যে বালিগঞ্জে আসিতেন, আসিলে অনেক সময়ে ৺পিতৃদেব পূজ্যপাদ পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়কে সংবাদ দিতেন এবং সম্ভবপর হইলে সাক্ষাৎকারের ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। ভাটপাড়া নিবাসী তাঁহার শিষ্য শ্রীশ্যামাপদ মুখোপাধ্যায় পূজ্যপাদ পিতৃদেবকে সঙ্গে লইয়া বালিগঞ্জে যাইতেন। ১৩২৯।৩০ সালে শ্রীমৎ সন্তদাস বাবাজী একটি বালককে ভাটপাড়ার ছাত্রভবনে পাঠাইলে তাহাকে ৺পিতৃদেব তাঁহাকে পড়াইতে পারেন, তাহার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পিতৃদেব সম্মতি প্রদান করেন। কিছুদিন পরেই একটি দুঃস্থ ন্যায়বর্ষ বালিপুষ্ট ভাটপাড়ায় উপস্থিত হইলে—আমাদের টোলে না রাখিয়া আমাদের গৃহেই তাহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। যুবকটির নাম ধীরেন্দ্রনাথ। অন্য ছাত্রগণ আমাদের গৃহের পার্শ্বে ভোজন করিত। ধীরেন্দ্র কিন্তু অপাকভোজন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে পিতৃদেব আমাদের পূজার দালানে একপার্শ্বে রন্ধনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

ধীরেন্দ্র এই অল্প বয়স হইতেই প্রত্যহ অধিকাংশ জপেই রত থাকিতেন। প্রাতঃকালে পিতৃদেব তাঁহার অবসর মত পাঠ গ্রহণ করিতে বসিলে ধীরেন্দ্র পাঠ গ্রহণ করিতেন। পাঠ সমাপ্ত হইবার পরই চলিল জপকার্য্য, পরে জপকার্য্যের কিছুক্ষণ বিরাম সেই সময়ে পাক করা হইত। পাকের বিশেষ কোনও আড়ম্বর ছিল না। প্রায়শঃ নিরামিষ ব্যঞ্জন ও অল্পমাত্র মৎস্যেই ধীরেন্দ্র পরিতৃপ্ত। ব্যঞ্জনের জন্য লোভ নাই—একটা কিছু হইলেই আহার সম্পন্ন হইত।

তখন হইতেই ধীরেন্দ্রমোহন স্বল্পভাষী—শান্তস্বভাব, নিরোধ ও জপপরায়ণ। আমি দেখিতাম ত্রিসন্ধ্যা অপেক্ষা জপেই মনোনিবেশ অধিক। আমি একদিন বলিলাম—ধীরেন্দ্র! ব্রাহ্মণের ত্রিসন্ধ্যোপাসনাই পরম কর্ত্তব্য। জপটা কিছু সঙ্কোচ করিলেও চলে। ধীরেন্দ্র বিশেষ কোন উত্তর না দিয়া তাহার গুরুর নির্দ্দেশের ইঙ্গিত করিলেন। পূজ্যপাদ পিতৃদেব মহাপ্রয়াণ ৺কাশীধামে চলিয়া গেলেন। তখন কিছুদিন আমার নিকটে অধ্যয়ন করিতে থাকিলে তাহার গুরুদেব শ্রীমৎ সন্তদাস বাবাজী বালিগঞ্জে আসিলেন। ধীরেন্দ্র তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়া সম্ভবতঃ ভাটপাড়ার পরিস্থিতি আলোচিত হইয়াছিল। ধীরেন্দ্র সেই সময়ে আমাকে এইরূপ সিদ্ধান্ত-কথা শ্রবণ করাইয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণের ত্রিসন্ধ্যা অবশ্য কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই, তবে গুরু যদি ক্ষেত্রবিশেষে গুরুমন্ত্র নিয়ত জপ করিতে সমর্থ ব্যক্তিকে আদেশ করেন, তাহা হইলে ত্রিসন্ধ্যাসময়েও ইষ্টমন্ত্র জপ করিলে প্রত্যবায় হইবে না। এইরূপ কথা তখন আমার কর্ণগোচর হইয়াছিল। শ্রীমান্ ধীরেন্দ্র সেই সময় হইতেই পূর্ণ জপযজ্ঞময় জীবন যাপন করিয়া আমাদের পরম বিস্ময় উৎপন্ন করিয়াছিলেন। আমার পিতৃদেব শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রকে অতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। ইহার শাস্ত্রবুদ্ধি আস্তিক্য

ও শান্ত স্বভাব তাঁহার পরম সন্তোষের কারণ ছিল। পূজ্যপাদ পিতৃদেব পেশোয়ারে চলিয়া যাওয়ায় ভট্টপল্লীতে অধিককাল অবস্থান সম্ভবপর হয় নাই। তৎপরে পণ্ডিত-প্রবর যামিনীকান্ত ন্যায় তর্কতীর্থ সমীপে ন্যায়শাস্ত্র সম্যগ্‌ভাবে অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যার পূর্ণতা সম্পাদন করেন।

আমাদের এখানে বঙ্গদেশের ও অন্যান্য প্রদেশের বহু ছাত্র আসিয়া অধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছেন কিন্তু ধীরেন্দ্রের ন্যায় বিদ্যার সহিত ভগবদ্ভক্তি এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুষ্ঠান প্রায়ই দেখা যায় নাই। কোনও প্রকার বিলাসিতা ছাত্রজীবনে দেখি নাই। আহারে, আচারে, বেশে একটা বিলাসশূন্য সরল ব্যবহার যৌবনকাল হইতেই শ্রীমান্ ধীরেন্দ্র নাথের লক্ষ্য করিয়াছি।

সেই সাধনার ফল আজ ভারতবাসী পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতেছেন। নিজ সাধনাবলে মানুষ যে পরম আচার্য্য পদে দেবত্বে মর্য্যাদায় অধিষ্ঠিত হইতে পারে—ইহার প্রত্যক্ষ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—আচার্য্য শ্রীমৎ ঘনশ্যামদাস কাঠিয়া বাবাজী। আমি বৃন্দাবনের আশ্রম বা গুরুগিরির দরুণ একান্ত সন্নিহিত সৌধের কথাও বলিতেছি না—আমি বলিতেছি—আজ শ্রীমৎ ঘনশ্যামদাসজী কত ধর্ম্মার্থী ধর্ম্মজিজ্ঞাসু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের হৃদয়াসনে উপবিষ্ট হইয়া যে শান্তিপ্রদান করিতেছেন, ইহাই সাধনার পরম ও চরম ফল।

নিম্বার্কসম্প্রদায়ের ধারাকে বঙ্গদেশে উজ্জীবিত করিলেন শ্রীমৎ সনকাদি বাবাজী—আবার তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধারাকে বিশেষভাবে উজ্জ্বল করিলেন—শ্রীমৎ ঘনশ্যামদাসজী। এই পরম্পরাকে রক্ষা করার জন্য বৃন্দাবন আশ্রমটিতে যে অপূর্ব্ব চিত্রশালা সন্নিবেশিত হইয়াছে—ইহা অতি বিরল দৃষ্টান্ত। শ্রীমৎ রামদাস কাঠিয়া বাবার মূর্ত্তি যেন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া নিম্বার্কসম্প্রদায়কে এক অপূর্ব্ব বিভূতিতে মণ্ডিত করা হইয়াছে। এ সমস্তই শ্রীমৎ ঘনশ্যামদাসজীর অক্লান্ত সাধনার ফল।

শ্রীনিম্বার্কীয় রসিকভক্ত শ্রীশ্রীভট্টাচার্য্যজী মহারাজ

ব্রজবিদেহী মহন্ত শ্রী১০৮ স্বামী ঘনশ্যামদাসজী কাঠিয়া বাবা

(পূজ্যপাদ লেখকের রচিত শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যাদ্যুত্তরবর্ত্তিআচার্য্যগণ, পূর্ব্বভাগ হইতে সঙ্কলিত)

শ্রীশ্রীভট্টজী শ্রীকেশবকাশ্মীরিভট্টজীর প্রধান ও অন্যতম শিষ্য ছিলেন। তিনিই পরে তাঁহার শ্রীগুরুদেবের গদীতে আসীন হইয়াছিলেন। শ্রীগুরুসিদ্ধদেবজীর বাণী হইতে জানা যায় যে তিনি গৌড় ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণ সকলেই তৈলঙ্গ দেশীয় ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব ছিলেন। তাঁহার পিতামাতা ও পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন জিলার অধিবাসী ছিলেন। শ্রীশ্রীভট্টজীর জন্মের বহুকাল পূর্ব্বেই তাঁহার পিতামাতা মথুরায় আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশজ আজও মথুরার ধ্রুবটীলায় বাস করিতেছেন। শ্রীশ্রীভট্টজী বাল্যকাল হইতেই তাঁহার পিতামাতা ও অন্যান্য গুরুজনদের নিকট শ্রীকেশবকাশ্মীরিভট্টজীর গুণকথা, মহিমা ও গুণগাথা শ্রবণ করিতেন। উপনয়নের পর অধ্যয়ন করিতে করিতে তাঁহার সংসারের প্রতি বৈরাগ্য আসিতে থাকে। তিনি মধ্যে মধ্যে শ্রীকেশবকাশ্মীরিভট্টজীকে দর্শন করিতে যাইতেন এবং তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতেন। এইভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, তাঁহার অন্তরে তীব্র বৈরাগ্য আসিল। মায়াময় সংসারের স্বরূপ তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন এবং তিনি বুঝিতে পারিলেন শ্রীগুরুদেবের কৃপা বিনা এই মায়াময় সংসার হইতে উদ্ধারের আর অন্য কোন উপায় নাই। তখন তিনি শিক্ষাগুরুকে তাঁহার মনের ভাব খুলিয়া বলিলেন এবং জানাইলেন যে, তিনি এই মায়াময় সংসারে আবদ্ধ না হইয়া শ্রীগুরুচরণাশ্রয়ে নিরত হইবেন। ইহাও বলিলেন যে, শ্রীকেশবকাশ্মীরিভট্টজী

ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ, তিনিই তাঁহাকে সংসার পাশের হইতে উদ্ধার করিতে পারিবেন। অতএব তিনি (শ্রীশ্রীভট্টজী) তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিবেন। পিতামাতাও শ্রীকেশবকাশ্মীরী-ভট্টজীর নিকট দীক্ষিত ছিলেন। এইরূপ পুত্রের এই কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে তাহাতে সম্মতি দিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া গিয়া শ্রীকেশবকাশ্মীরিভট্টজীর শ্রীচরণে সমর্পণ করিলেন। তিনিও শ্রীশ্রীভট্টজীকে গ্রহণ করিয়া পঞ্চসংস্কার দ্বারা সংস্কৃত করিয়া দীক্ষা প্রদান করিলেন এবং বলিলেন—"তুমি আজ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইলে; এখন হইতে পরম নিষ্ঠার সহিত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন কর এবং তৎসহ শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের—

স্বভাবতোঽপাস্তসমস্তদোষমশেষকল্যাণগুণৈকরাশিম্।
বৃন্দাটবীং ব্রহ্ম পরং বরেণ্যং ধ্যায়েম কৃষ্ণং
কমলেক্ষণং হরিম্॥

অঙ্গে তু বামে বৃষভানুজাং মুদা
বিরাজমানামনুরূপসৌভগাম্।
সখীসহস্রৈঃ পরিসেবিতাং সদা স্মরেম দেবীং
সকলেষ্টকামদাম্॥
(দশশ্লোকী ৪-৫)

এই দুই শ্লোকে তিনি যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণযুগল উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন, সেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যথাযথরূপে উপাসনা করিতে থাক এবং যুগলস্বরূপের লীলারস আস্বাদন করিতে থাক।

শ্রীগুরুবাক্য তাঁহার অন্তরকে এমনভাবে অধিকার করিয়া বসিল যে, তিনি তাহা কখনও ভুলেন নাই। তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যব্রত দৃঢ়তার সহিত পালন করিতে করিতে অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত যুগল উপাসনা করিতে থাকিলেন।

অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীশ্যামশ্যামের মধুর রসোপাসনার পরম্পরা অতি প্রাচীন। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, সংহিতা, তন্ত্র আদি সমস্ত ভারতীয় বাঙ্ময়ে ইহা বীজরূপে সন্নিহিত আছে। কিন্তু উপাসনা জগতে সর্ব্বপ্রথম ভগবান্ শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যজী এই মধুর রসোপাসনা উদ্ঘাটন করিয়াছেন। তাঁহারই অন্যতম শিষ্য শ্রীঔডুম্বরাচার্য্য তাঁহার 'ঔডুম্বর-সংহিতা'য় এই রস উপাসনার পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তব্য এই যে, শ্রীযুগলসরকার বৃন্দাবনে নিত্যই বিহার করিতে থাকেন। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ—দুইই সমভাবে অবস্থিত আছেন। দুইরূপে দুইটি দেহ হইলেও বাস্তবে দুই একই। এই ভাব অধিক স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য উদাহরণ দিলেন —দুই কল্লোলের। যেরকম একই নদীতে প্রবাহিত দুই কল্লোল (লহর) পৃথক্ পৃথক্ দেখা যায়, পরন্তু দুই কল্লোল মিলিয়া একরূপ হইয়া যায়, সেইরকম ইঁহাদেরও বিশ্লেষণ কোন প্রকার সম্ভব নহে। এই কথাই শ্রীঔডুম্বরাচার্য্য শ্লোকাকারে বলিয়াছেন—

জয়তি সততমাদ্যং রাধিকাকৃষ্ণযুগ্মং,
ব্রতমুকুতনিদানং যৎ সদৈতদ্বিমুগ্ধম্।
বিরলসুজনগম্যং লক্ষিতানন্দরূপম্
ব্রজবনবিহারং নিত্যবৃন্দাবনস্থম্।
কল্লোলকৌ বস্তুত একরূপকৌ,
রাধামুকুন্দৌ সমভাবভাবিতৌ।
যদং মুদস্পৃক্তনিমাকৃতিপ্রিয়া-
বারাধয়ামো ব্রজবাসিনৌ সদা।

দ্বাদশ শতাব্দীতে বৃন্দাবনরসৈশ্বর্যের অমর গায়ক পীযূষবাগ্বাদিনী আচার্য্য শ্রীজয়দেবজী স্বীয় সুললিত পদাবলীতে এই মধুর রসের ধারা এমনভাবে বহাইয়াছিলেন যে সমস্ত ভারতীয় বাঙ্ময় রসপ্লাবিত হইয়া উঠিয়াছিল।

ত্রয়োদশ-চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে তাঁহারই পরবর্ত্তী একজন আচার্য্য শ্রীশ্রীভট্টজী সেই মধুর রসকেই ব্রজভাষার মাধ্যমে বিকশিত করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীভট্টজী তাঁহার রচিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক পদগুলি একশত শতকে রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমানে কেবল একশতকই পাওয়া যায়। এইরকম জনশ্রুতি আছে যে, শ্রীভট্টাচার্য্যজী এই শতকগুলি রচনা করিয়া যখন স্বীয় গুরুদেব শ্রীকেশব-কাশ্মীরিভট্টাচার্য্যজীর সমক্ষে লইয়া গিয়াছিলেন, তখন তিনি সেইগুলি যমুনাজীকে সমর্পণ করিয়া দিয়াছিলেন। যমুনাজী কেবল একশতক বাদে অন্য সমস্ত শতক ভাসাইয়া

লইয়া গিয়াছিলেন। এই অবশিষ্ট শতক 'যুগল-সত'ই আজ 'যুগল-শতক' রূপে বিখ্যাত হইয়াছে।

বাস্তবিক পক্ষে শ্রীভট্টজী শ্রীভগবানের যে সমস্ত লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন সেই সমস্ত লীলাই এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। এইজন্য ইহা 'আকাশবাণী' বা বেদবাণীর সমান। ইহাই সর্বপ্রথম ব্রজভাষায় লিখিত পদাবলী সাহিত্য। এইজন্য ইহা 'আদিবাণী' নামে খ্যাত হইয়াছে এবং শ্রীভট্টাচার্যজী 'আদিবাণীকার' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। এই গ্রন্থ ব্রজভাষার রচনাবলীর মধ্যে 'আদিকাব্য'রূপে প্রতিষ্ঠিত আছে।

এই গ্রন্থে একশত আভাস দোহা এবং দোহার অর্থের বিশদীকরণের জন্য নানা রাগে সম্বলিত একশত পদ আছে। বিষয়ক্রমানুসারে ইহা ছয় সুখে বিভক্ত। (১) নিত্যসুখ (১-১০), (২) ব্রজলীলাসুখ (১১-৩৯), (৩) সেবাসুখ (৩৮-৫২), (৪) সহজসুখ (৫৩-৭৩), (৫) সুরতসুখ (৭৪-৮১), (৬) উৎসবসুখ (৮২-১০০)

এই পদগুলি আস্বাদন করিলে শ্রীনিম্বার্কীয় বৈষ্ণবদের রসসিদ্ধান্তের একটি বিশেষ রূপ জ্ঞাত হওয়া যায়। উপাসনার সময়ে অন্তরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলস্বরূপের যে ভাব যখন উদিত হইয়াছে এবং যখন যেরূপ যুগলসরকারের লীলা দর্শন হইয়াছে, তখনই শ্রীভট্টজী তাহা কবিতার দ্বারা লিখিয়া রাখিতেন। তাঁহার লেখার প্রথম কয়েকটি কবিতা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি (এই সব কবিতা, রাগরাগিনী ও তালের সহিত তিনি গান করিতেন, তাই সেগুলিও কবিতার সঙ্গে লিখা আছে)

দোহা— "চরণ কমল কী সীঁজিয়ে সেবা সহজ বসাল।
ঘর আরো মুঁহি আনিকৈ চেরো মদন গোপাল।

পদ— (কেদারো) মদন গোপাল
শরণ তেরী আয়ো।
চরণ কমল কী সেবা দীজে চেরো
করি রাখো ঘর আয়ো। ১
ধনি ধনি মাতাপিতা সুত ধনি জননী
জিন মোহ খিলায়ো।
ধনি ধনি চরণ চলত তীরথকো ধনি শুভ
জিন হরিধাম সুনায়ো।
জে নর বিমুখ ভয়ে গোবিন্দ সোঁ জন্ম
অনেক মহা দুখ পায়ো।
শ্রীভট্ট কে প্রভু দিয়ো অভয়পদ জম ডরো
জব দূত কহায়ো। ২

দোহা— শ্যামা শ্যাম স্বরূপ সরোরুহ পদি আনন্দ বিলাস হু।
জাকো মন আনন্দঘন, বৃন্দাবিপিন হরো হু।

পদ—(গৌরী) জাকো মন বৃন্দাবিপিন হরো।
শ্যামাশ্যাম স্বরূপ সরোরুহ পদি আনন্দ বিলাসো
নিরখি নিপুণ পুত ছবি রাচে, চক্ষু নাম উর ধরো।
জৈ শ্রীভট্ট রাখে হরিদাস রায় তাহি সর্বস দৈ নিবেরো। ১০

শ্রীশ্রীভট্টজী সর্বদা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলসরকারের গুণগান, ধ্যান, রাসলীলা দর্শন ইত্যাদিতেই মগ্ন থাকিতেন, অতি অল্প সময়ও অন্য কোন বিষয়ে তাঁহার মন যাইত না; মৎস্য যেমন জল হইতে পৃথক হইলে জীবিত থাকিতে পারে না, তদ্রূপ তিনিও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলসরকারের দর্শন, গুণগান প্রভৃতি রহিত হইয়া থাকিতে পারিতেন না। এই বিষয়ে শ্রীকালচরণজী ভট্টমহাশয় একটি ছন্দে অতি উত্তমরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

নব রস রঙ্গ পরবীন গোপলীলা
মন বচ ক্রম উর ধ্যান নমো
নিত্য প্রিত রাস-বিলাস জান হেরহর গুণগাতো।
মীন নীর জ্যুঁ ত্রিত দেহ কুলক্রিত তজ নাতো।
কৌন জগত মেঁ যৌ বন হৈ নিরধীন
ভক্ত চিত্ত হিত হর।
অবট প্রেম শ্রীভট্ট সুরস নবধা আগর
পুণ্য বয় ।২৪৪।

শ্রীভট্টজী যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলসরকারের চরণের অনন্য উপাসক, তাহা তিনি স্বয়ং নিম্নলিখিত পদে লিখিয়াছেন, যথা—

সহজ সেব্য হমারে শ্রীপ্রিয় পায়ে বৃন্দাবিপিন বিলাসী।
নন্দনন্দন বৃষভানুনন্দিনী চরন অনন্য উপাসী।
মত্ত প্রনয়বস সদা একরস বিবিধ নিপুন নিবাসী।

হৈঁ শ্রীভট যুগল বংশীবট সেবত মুরতি সব সুখরাশী।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল উপাসনার সময় শ্রীশ্রীভট্টজী শ্রীযুগল সরকারের লীলা প্রত্যক্ষ করিতেন এবং লীলারসে আস্বাদন করিতেন, তৎসমস্তই তিনি কবিতার দ্বারা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন, সেগুলি 'যুগলশতক' গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার এই 'যুগলশতক' গ্রন্থখানিতে তাঁহার দিব্য জীবনের উপলব্ধি হয়। তাই তাঁহার জীবনের কিঞ্চিৎ প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে নিম্নে মর্মার্থ সহিত কিছু কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি। গ্রন্থভাষার কবিতাগুলি এতই মধুর যে তাহাও উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

একদিন শ্রীশ্রীভট্টজীর শ্রীভগবানের রাসলীলা দর্শন করার ইচ্ছা হইলে, শ্রীভগবান্ তখনই রাসলীলা দর্শন করাইলেন। তিনি দেখিলেন—ললিত ত্রিভঙ্গ বিহারী শ্রীভগবান্ ঘোর অরণ্যের মধ্যে বংশীধ্বনি করিলেন, তাহা শুনিয়া গোপকুমারীগণ মুগ্ধ হইয়া সেই ঘোর অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহারা দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ চরণের উপর চরণ রাখিয়া হস্তের বাঁয়ে স্কন্ধে বেত্র ও হস্তকে চূড়ট ধারণ করিয়া ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তিতে শ্রীরাধার সহিত দণ্ডায়মান আছেন এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছেন, যথা—

দোহা—চরণ চরণপর লকুট ধর, ধরেঁ কক্ষ নব রঙ্গ।
মুকুট চটক ছবি লটক লখি, বনে হু ললিত ত্রিভঙ্গ।
পদ— (রাগ বিহাগরো) বনে বন ললিত ত্রিভঙ্গ বিহারী।
বংশী ধুন ধারেঁ। বনমে নারী আরঁ গোপকুমারী।
অরণ্যো চারু চরণ পর উপর লকুট কঙ্কণ ধারী।
(যৈ) শ্রীভট মুকুট চটক লটকনি যেঁ অটকি রহী পিয়
প্যারী ॥২২

অতঃপর শ্রীশ্রীভট্টজী দেখিলেন—

শ্রীকৃষ্ণ এরূপ ধারণ করিয়া এক এক শ্রীকৃষ্ণ দুই দুই গোপকুমারীর গ্রীবাতে দুই বাহুধারণ করিয়া ভ্রূকুটির দ্বারা তাঁহাদের নয়নে নয়ন মিলাইয়া মণ্ডলাকারে স্থিত হইলেন এবং ঐ মণ্ডলের মধ্যস্থানে পৃথক্‌ভাবে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত যুগলরূপে অবস্থিত হইলেন, তৎপর বৃন্দাবনীত সরকারে কোটি মদনের মনোমুগ্ধকর পরংবিহারস্বরূপ রাসলীলা করিতে লাগিলেন, তাহাতে গোপকুমারীগণ অনন্ত আনন্দ সুখ উপভোগ করিতেছেন—শ্রীশ্রীভট্টজী এক দৃষ্টিতে তাহা দর্শন করিয়া পরমানন্দে মগ্ন হইলেন, যথা—

দোহা— বরত রূপ ধরি হরিপ্রিয়া মনরঞ্জন হল দেত।
বয়ন মনমোহন মিথুনমণ্ড মধি ছবি লেত ॥২৩
পদ—মণ্ডল মধি বিমল যুগল ভল সোহৈ।
করত বিহার বিহারী প্যারী মার কোটি মন মোহৈ॥
বরত রূপ ধর সব মনরঞ্জন ইক প্রতি অধনা দো হৈ।
মণ্ডলাকার অপার বড়ো সুখ হরি সম্মুখ সব কো হৈ।
সবনি মানি মন মুদিত হিয়ে যে নিজ রস
রাস রচ্যো হৈ।
দম্পতি অন্তর ভুজ গ্রীবা ভুজ ভৌহ ভ্রুকুটি
থির কো হৈ।
নয়ন নয়ন মিলি নৈন বিক্ষেপন নৈন কী
নৈন মিলো হৈ।
'শ্রীভট' অটকি রহে জিতকে তিত নিজ-নিজ
লগন লগো হৈ।
দোহা—সব মিলি নিরখত যুগল ছবি গোপী মণ্ডলাকার।
বীচ যুগল সরসাবহীঁ অতি রুচি সরস বিহার ॥২৪
পদ—অতি রুচি পাবত সরস বিহার।
বীচ যুগল সোহৈ মন মোহৈ গোপী মণ্ডলাকার।
বড়ভ জমাবৈ সরস বতাবৈ সব মিলি গাবৈ যুগল বিহার।
'শ্রীভট' নবল নাগরী নাগর তাতা থেই করত উচার ॥

শ্রীশ্রীভট্টজীর মনে যখন যেভাবে দর্শন করিবার ইচ্ছা উদিত হইত, তখনই তদ্রূপে শ্রীশ্রীযুগলসরকার দর্শন দিয়া তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতেন। একবার তাঁহার ইচ্ছা হইল—শ্রীশ্রীযুগলসরকার যখন বিজিতেছেন, তাঁহাদের পরিহিত বস্ত্র পোষাক ঘাংরা ইত্যাদি ভিজিতেছে,—ইহা তবে আমি দেখিব। যেমনি ইহা মনে করিয়াছেন, তেমনি দেখিলেন শ্রীশ্রীযুগলসরকার ঝুলে দণ্ডায়মান আছেন, এমন অবস্থায় ঘনঘটা করিয়া বর্ষা আরম্ভ হইয়া গেল। তিনি তাহা দেখিয়া অন্তরে বেদনা অনুভব করিয়া বলিতেছেন—আহা! ইঁহারা ও ইঁহাদের পোষাক ঘাংরা ভিজিতেছে—আমি তাহার জন্য কোন যত্ন করিলাম না। ইহা নিম্নলিখিত

কবিতায় বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

দোহা—ঠাঢ়ে গাঢ়ে কুণ্ডল, ঘাঢ়ে মেঁন মরোর।

ভীজত কব ইন যুগল তে, নেখো যুগল কিশোর ৮৮

পদ—(ইকতালা-রাগ মল্লার) ভীজত কব দেখোঁ ইন নৈঁনা

ভাষা মু কী গুরুজ চুনরী মোহন কো উপটৈনা।

যুগলকিশোর কুঞ্জ মহ ঠাঢ়ে, যতন কিয়ো কছু মৈ না।

উমড়ী ঘটা চহুঁদিসি প্রীতট ঝুঁড়ি আই জল সৈনা।

একটি কবিতায় শ্রীভট্টজী বলিতেছেন—শ্রীভগবানের নিজ স্থান এই বৃন্দাবনে চতুর্দশ ভুবনের সমস্ত সৌন্দর্য্য বিরাজ করিতেছে, কেন না শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলসরকার ইহার সর্ব্বত্র ও বিশেষ করিয়া বংশীবটে লীলা করিতেছেন। এইরূপ বলিয়া শ্রীশ্রীভট্টজী বলিতেছেন—আমার একটি রসনার দ্বারা এই লীলার কতটুকু বর্ণনা করিব, লক্ষ রসনাও তাহা বর্ণনা করিতে অক্ষম, যথা :—

দোহা—ভুবন চতুর্দশ কী সবৈ, সুন্দরতা সির মোর।

সুন্দর বরজোরী বনী, বৃন্দাবন নিজ ঠৌর ৪৮

পদ—(তিতালা)—বৃন্দাবন ইক সুন্দর জোরী।

খেলত জহাঁ তহাঁ বংশীবট, নন্দনন্দন বৃষভানু কিশোরী।

ভুবন চতুর্দ্দশ কী সুন্দরতা, সুন্দর শ্যাম রাধিকা গৌরী।

জৈ শ্রীভট্ট কহাঁ লৌ বরনৌঁ রসনা এক নাহি লখ কোরী।

ইহার পর লিখিতেছেন রাধা ও মাধব এই যুগল অদ্ভুত। সখা সনাতন একরস হইয়া সেই নবল কিশোর-কিশোরী বিহার করিতেছেন। তাঁহাদের নখ চূড়া ইত্যাদি সবই সুষমার সাগর, তাহার দ্বারা রসিকশ্রেষ্ঠদের হৃদয়-সরোবর পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। কণ্ঠে কটক-বলয় ও গণ্ডে ঝোলুল্যমান কুণ্ডল প্রভৃতির দ্বারা যুগলসরকার অতিশয় শোভায়মান হইয়াছেন। কবিতা, যথা :—

দোহা—নখ শিখ সুষমা ঝোড়, রতনাকর রসিকেস।

অদ্ভুত রাধামাধবী, জোরী সহজ সুদেস ৫১

পদ—(তিতালা)—রাধামাধব অদ্ভুত জোরী।

সখা সনাতন ইক রস বিহরত অবিচল নবল কিশোর-কিশোরী।

নখ শিখ সব সুষমা রতনাগর, ভরতহরিকর হৃদয় সরোরী।

জৈ শ্রীভট্ট কটক কুণ্ডল, গণ্ডঝলক রিসি লসত হিলোরী।

অতঃপর লিখিতেছেন—পারীর (শ্রীরাধার) সরীর শ্যাম (শ্রীকৃষ্ণ), শ্যামের সরীর প্যারী, শ্যামের সরীরে শ্রীরাধার সরীরের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, আর শ্রীরাধার সরীরে শ্যামের সরীরের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, যেমন দর্পণে প্রতিবিম্বিত নয়নের সহিত নয়নের ভেদ দেখা যায় না এবং নয়নের সহিত দর্পনস্থ নয়ন একই প্রতীত হয়, তদ্রূপ শ্যাম ও শ্যামের পরস্পরের উপর পরস্পরের প্রতিবিম্ব পড়ায় এক নিমেষের জন্যও উভয়ের ভেদ দেখা যায় না অর্থাৎ কে শ্যাম, আর কে বা শ্যামা তাহা বুঝা যায় না। শ্রীভট্টজী এই অপরূপ বিগ্রহের প্রতি তাঁহার দেহ মন প্রাণ সমর্পণ করিলেন। কবিতা, যথা:—

দোহা—দর্পন মে প্রতিবিম্ব জোঁ নৈঁন হু নয়ননি মাঁহিঁ।

যোঁ প্যারী নিজ পরতর, স্যামে নিচিঁ হরষাহিঁ ৬০

পদ—(তিতালা) প্যারী তন শ্যাম শ্যামা তন প্যারো।

প্রতিবিম্বিত তন অবনি পরনি দোউ একপলক দিখিবত নহিঁ ন্যারো।

জোঁ দর্পনমেঁ নৈঁন নৈঁন মেঁ, নৈঁন সহিত দর্পন দিখবারো।

(তৈ) শ্রীভট্ট জোটকি অতিসুবি উপর, তন মন ধন ন্যোছাবরি তারো।

আর এক কবিতায় বলিতেছেন—কৃষ্ণ বিলসে নন্দ গোপাল ও অতিপ্রিয়তম প্যারী বৃষভানুসুতা শ্রীরাধা বিহার করিতেছেন, তাহা দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত প্রসন্ন হইতেছেন, তদ্রূপ পুষ্পোদ্যান সমূহও প্রসন্ন হইতেছে, অর্থাৎ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া অতি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। শ্রীভট্টজী পুষ্প দ্বারা মালা গাঁথিয়া সেই মালা যুগল সরকারকে পরাইতেছেন, তাঁহারও তাহা কণ্ঠ হইতে বক্ষে লম্বমানভাবে ধারণ করিলেন,—কবিতা, যথা—

দোহা—বৃন্দাবন ফুলবার মেঁ, পহিরি ফুল উরমাল।

বিহরত শ্রীবৃষভানুজা, নন্দন গোপাল ৬১

পদ—(তালচম্পক) নন্দনন্দন গোপাললাল বৃষভানু দুলারী।

বিহরত বৃন্দাবিপিন মেঁ, অতিপ্রীতম প্যারী।

অবশ পরশ পরমন হোত, তৈসিয় তুলী তুলবারী।
তৈ শ্রীচট্ট সগ দেশী সংবারি, হরিপ্রিয়া উতধারী।

এই সমস্ত বর্ণনা হইতে ইহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে শ্রীশ্রীঅদ্বৈতজী শ্রীশ্রীসীতানাথের যে সমস্ত লীলা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাই তিনি এই 'যুগলশতক' গ্রন্থে কবিতাকারে লিখিয়াছেন।

অমৃত বাণী

(সংকলন)

শ্রীসোম্যদেব চট্টোপাধ্যায় এম. এ

তুলসী জগ জীবন অহিত কত র্ কোউ হিত জানি।
শোষক ভাহু চলায় যহি পবন এক ঘন হানি।"

হে তুলসী, জগতে এমন অনেক প্রতি অহিতাচরণে রত, খুঁজলে এমন জীব বহু পাওয়া যাবে কিন্তু অন্যের হিতকারী ক'জন? দেখ, পৃথিবীর স্নিগ্ধ রসধারাকে শুকিয়ে মেরে জন্য সূর্য, অগ্নি, পবন, পৃথিবীর স্নিগ্ধ মাটি—সকলেই তৎপর। কিন্তু জলধারা দান করে শুষ্ক তাপিত ধরিত্রীকে স্নিগ্ধ করতে একমাত্র মেঘই এগিয়ে আসে!

• •

আজ হমারো কয় রহি, যে জায় এ হু।
অয় মে হু কানি পুদা, বা নায় এ হু।

—সূফী জালাল

যদি তুমি ব্রহ্ম (হু), এই শব্দটি শুনিয়াই সন্তুষ্ট থাক, (অর্থাৎ ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য চেষ্টা না কর) ব্রহ্মরস পান না কর তবে বাসনাজাল হইতে কেমন করিয়া তোমার মুক্তিলাভ হইবে?

• • •

অব ম্যায় থা তব হরি নহি, অব হরি হৈ ম্যায় নহি
প্রেম গলি অতি সাঁকরী, তামৈ দোনে ন সমাহি

—কবীর

যখন মানসপটে "আমি" ছিলাম, তখন হরির স্থান ছিল না। এখন হরিই আমার সকল চিত্ত জুড়িয়া আছেন, কাজেই সেখানে "আমি"র স্থান নেই। প্রেমের গলী যে অতি সঙ্কীর্ণ।

• • •

ঈশ্বর অভিপ্রেত যে দুঃখ তাহা আমাদের মনে অনুতাপাদি আনিয়া দিয়া আমাদের পরিত্রাণের পথ উন্মুক্ত করে। তাহার জন্য অনুশোচনার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু জগৎ যে দুঃখ দেয়, সেই দুঃখ মৃত্যু তুল্য।

বাইবেল (২য় করি: ৭:১০)

• • •

অভ্যাস এবং বিচার—উভয়ই মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জীবের জন্য প্রয়োজনীয়। অভ্যাস অর্থাৎ মনের লয় দ্বারা আত্মস্থ হইতে চেষ্টা করা, বিচার অর্থাৎ জীবদ্দশাতে যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতেছে সর্বদা সচেতন থাকিয়া তাহার নিত্যানিত্য বিচার করা এবং ঐ সকলের সঙ্গে সম্বন্ধযোগে যে সকল ভাবের উদয় হইতেছে, তদ্দ্বারা অভিভূত না হইয়া নির্লিপ্ত থাকিয়া সর্বদা আত্মানুসন্ধান করা।

—সোঽহং স্বামী

• •

অপরোক্ষানুভূতির্যা বেদান্তেষু নিরূপিতা।
প্রেমলক্ষণভক্তেস্তু পরিপাকঃ স এব হি।

বোধসার ভক্তিপ্রকরণ ১০

বেদান্তে যা অপরোক্ষানুভূতি বলে নিরূপিত, সেটী প্রেম-লক্ষণা ভক্তিরও পরিপাক।

•

সা তু কর্মজ্ঞানযোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা।

নারদভক্তিসূত্র ২৫

তাহা (অর্থাৎ ভক্তি) কর্ম, জ্ঞান ও যোগ হইতেও মহত্তর।

মনের কথা

শ্রীসুব্রত সেনগুপ্ত, এম. এ

কি সুন্দর কথাটি—মন চল নিজ নিকেতনে! সত্যই ত—ভারতীয় সাধনার মূল কথাই ত হল নিজ নিকেতনে ফিরে যাওয়া। মোক্ষ বল, মুক্তি বল—সবারই ত একই উদ্দেশ্য সেই একটি—যেখান থেকে এসেছি, যাঁর কাছ থেকে এসেছি—সেখানে, তাঁরই কাছে ফিরে যাওয়া। সকলেই ত অনেছ সেই কথা অর্থাৎ সাধনার পরিসমাপ্তি ঘটা সাধনার সপ্তমভূমীতে আরূঢ় হলে; ভগবান নিজেই ত জানিয়েছেন এই নিজ নিকেতনে যাবার কথা অর্থাৎ সাধনার সপ্তভূমীতে পৌঁছালেই—"অতো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্"। কিন্তু এই যে 'বিশতে' তাতে প্রবেশ করে তাঁতেই লীন হয়ে যাবার কথা—বস্তুতঃ তিনি আছেন কোথায়, কোথায় থাকেন তিনি? কেন, শোন নি তোমরা? শাস্ত্র বল, মহাপুরুষদের বাণী বল, সবাই ত ইঙ্গিত দিয়েছেন তার। শাস্ত্র একবার তাঁকে বলছেন গুহাহিতং—তিনি হৃদয়গুহাতেই আছেন। আবার বলছেন, তিনি পুরুষ—পুরী শেতে ইতি পুরুষঃ—হৃদয় পুরীতেই তাঁর আসন। শ্রুতি বলছেন "তমাত্মস্থং যে অনুপশ্যন্তি ধীরাঃ"। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বললেন—ভক্তের হৃদয়ই ত ভগবানের বৈঠকখানা! এমন কি এই যে গীতার কথা—"হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি"—তারে প্রতিধ্বনি তুলছেন সেই দূর গেরামের ঠাকুমা বুড়ী পর্য্যন্ত যে। সে কি কথা? হ্যাগো ভাই। দেখনা, গাঁয়ের ছোট ছেলেটিকে, ঠাকুমার নাতিটিকে হয় ত গাঁয়ের আঁধারে পুকুরের পাশ দিয়ে আসতে হয়, সেখানে পুকুরের কালো জলের উপর বাঁশবাড়ের কালো ছায়া পড়েছে; কালো জল, কালো ছায়া, কালো আঁধারে যেন একেবারে মিশেমিশে করেছে এক কালো আঁধারপুরী; সেখানে নিত্য মনের ভাবনা—থাকে ভূত, প্রেত, দত্যি, দানব, তাই ছোট ছেলেটি যদি ভয় পায়, ঠাকুমা খুব জোরে জোরে, চীৎকার করে লোলোক বলতে বললেন—"ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি, রাম লক্ষণ বুকে আছেন ভয়টা আমার কি?" ভূত প্রেতের কথা থাক লোলোকের দ্বিতীয় লাইনটি লেখ না—রামলক্ষণ "বুকে" আছেন অর্থাৎ শাস্ত্র থেকে আরম্ভ করে গাঁয়ের বুড়া পর্য্যন্ত—সকলের একই কথা যে, সেই নিকেতনটি মানুষের অন্তর্লোকেই।

নিকেতনের হদিস তো পেলাম, যাব কি করে? এখানেই আসল কথা এসে পড়ল। শাস্ত্র ত বলছেনই; কিন্তু কি আশ্চর্য্য কথা—পূবের সূর্য্য যখন অস্তাচলে চলে পড়লেন পশ্চিমাকাশে, অস্তাচলের পথ রাঙ্গা হতে হতে ধীরে ধীরে মিশে যাচ্ছে গাঁয়ের আঁধারে, তখন গাঁয়ের বুকে শেষ পাহারীর কড়ি নিয়ে যায় যে শ্রান্ত মাঝি, সেও ক্লান্ত ভাটিয়ালীর বিষন্ন সুরে আভাস দিল কি করে যাব—"মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে, আমি আর বাইতে পারিনে" অর্থাৎ হৃদয়পুরে যাবে তো একমাত্র মন মাঝিই পারে সেখানে নিতে। মন গেল বৈঠা মারতে কিন্তু বৈঠা আর চলে না—মন যে এ কাজে অপারগ। গুরু এসে আশ্বাস দিলেন, হেঁকে বললেন—মনুষ্যরূপে তুই বেয়ে যারে দাঁড়, তোর হালে বসে আছেন গুরু, কি বা ভাবনা কি বা আষাঢ়"। কিন্তু হলে কি হবে, মন ছাড়া যাবার উপায় নেই অথচ মনই বেঁকে বসল; "গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনের দয়া হলে, একের দয়া বিনে জীব ছারখার গেল।"

তাই সাধনার পথে পা দিতে গেলে প্রথমেই আসে মনের কথা। তাই দেখি ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের চরণাশ্রয় পেয়েও, মোক্ষমুক্তির চাবিকাঠিটি হাতে পেয়েও চারিদিকে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠানকারী স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষের আর্ত্ত হাহাকার—মন যে বসে না? কি করে হবে সাধনভজন? সাধনার পথে যাঁরা পা দিয়েছেন সবে মাত্র, তাদের কথা ত বাদই

দিচ্ছি ; আজীবন সাধনা করে যাচ্ছেন এমন বহু সাধারণ মানুষও দুঃখ করে বলেন—মন যে বসে না ! তবে উপায় কি ? ঐ দেখ গো, প্রথমেই লেখক অনুচিন্তন নেবার কথাটি মনে আনছ না কেন ? তিনি বলেন নি—যেখানে পদে পদে বিঘ্ন, সেখানে পায় পায় উপায় ? মন যদি তৈরী হয়, তাকে বসানো আনার উপায়টি ভাবতে হবে যে ?

উপায়ের কথা ভাবতে গেলে প্রথমেই মনে আসে গীতায় শ্রীকৃষ্ণের কথা—"অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় ইত্যাদি"। তবে এই অভ্যাসের কথা পরে ; গোড়ার কথা হল যে, এই বিবাগী মনকে ঘরমুখী অর্থাৎ নিকেতনমুখী করতে হলে একটু বিচার করবার প্রয়োজন বোধ হয় না কি ? বিচারে যখন প্রশ্ন উঠে—মন কোথায়, উত্তরও মেলে যে মন ত এই দেহকোষেই রয়েছে। যাঁদের মন নির্মল হয়েছে, মনের আয়নায় ভগবানের ছায়া পড়েছে, তাঁদের কথা বলি না, দেখছের মত একেবারে জ্ঞানবুদ্ধি বা শুদ্ধিনিষ্ঠাচীন যদি কেউ থাকেন (আছেন কি না জানি না) তাঁদের দেহটিও জড় এবং এই জড় দেহে আবদ্ধ মনও জড়। একে ত আধার ও আধেয় দুইই জড়, তার উপর আবার তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে পিছনে ফেলে আসা জন্মজন্মান্তরের বিকৃত সংস্কারগুলি। কাজেই মন চঞ্চল হওয়া সাধন ভজনে মন না বসা, দুরাকাঙ্ক্ষার বোঝা নিয়ে মনের বিপথগামী হওয়া—এ ত হবেই ? স্বয়ং অর্জুনও যে রণক্ষেত্রে হতাশ হয়ে পার্থসারথীকে বলেছিলেন যে মনকে সংযত করতে পারছেন না। কাজেই বিচারে বোঝা গেল চঞ্চল হওয়াই, বিপথে যাওয়াই স্বাভাবিক বৃত্তি। তাহলে ভেবে দেখ ত মন বসে না, মন কুবিষয়ে প্রধাবিত হয়—এ সব নিয়ে হতাশ হবার কোনও অর্থ হয় কি ? এটাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিলেই ত হল ?

এবার মনকে বশে আনবার কথা। এর জন্য সন্ধানে ছোটা চালিয়ে যাওয়ার দরকার। মন যদি বশে না আসে, তা হোক না ? মনের চঞ্চলতাকে উপেক্ষা করলেই মনের গায়ে লাগায় পড়ে, তার দুর্গতি গতি বীত হয়ে আসে। এর জন্য পাঁচ, দশ, পঞ্চাশ বছর যে কোনও দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হতে পারে, আমার বুঝে। মন বসে না বলে হাহুতাশে যদি সময় যায়, তবে কিছুই ত হল না ? তাই থেকে—এক ঘণ্টা সাধন ভজনে দুমিনিটও যদি মন স্থির হয়, তাই কি পরম লাভ নয় ? যে চঞ্চল মন সর্বদা বিপথগামী, সেই কিন্তু আবার আমাদের করে যোগী ! এ কেমন কথা গো ! হ্যাঁ ভাই ; ভেবে দেখ, মন মন্ত্র সাধনে আমাদের প্রত্যেককে ইষ্টের সঙ্গে যুক্ত করছে—সে এক লহমার জন্যই হোক বা অনুক্ষণের জন্যই হোক। সে দিক দিয়ে দেখলে যেটুকু সময় মন স্থির হয়ে শ্রীগুরুগোবিন্দের চরণের সাথে আমাদের যোগ সাধন করে দেয়, সেটুকু সময়ের জন্য আমরা যোগী হয়ে যাই না কি ? যোগ হলেই ত যোগী।

একটি কথা। শ্রীগুরুদেবই ত আমাদের বলেছেন যে সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিনটি গুণের জোয়ার ভাঁটা, সর্বদাই চলেছে মনে। তমোগুণের এমন কি কর্মে প্রবৃত্ত করবার প্রভাবের প্রাবল্য যে সব সময় থাকবে তা ত নয় ? সত্ত্বগুণের জোয়ারও আসে মনে, শুধু সচকিত থাকতে হয় তার জন্য, কারণ সে যে কখন আসবে, খুঁজি পেতে ঠাঁক করে তা ত বলা যায় না এবং তার স্থিতিকালও বলা যায় না। যদি এক লহমার জন্যও হয়, ঠিক সেই মুহূর্তে জপ সাধনে নিজের মনটিকে শ্রীগুরুগোবিন্দের পায়ে লুটিয়ে দিলে সহস্র জপের কাজ হয় না কি ? আসল কথা হল মন চঞ্চল ও বিপথগামী বলে কেঁদে ভাসাতেও নেই, হাত পা ছেড়ে বসে থাকতেও নেই। অহরহ অনুক্ষণ যদি জড়ের মতই কাজ করে তাতে চিন্তার কি কারণ আছে ? এরূপ চিন্তা যেমন অর্থহীন, তেমনই অর্থহীন এ কথা ভাবা—মনটা একটু স্থির হলেই চারদিক গুছিয়ে ভাবপর জপধ্যান করতে বসব। এ কি হয় ? ওগো, তোমরা স্মরণ কর না দুটি গানের দুটি কলি—"কবে তুমি আসবে বলে আমি রইব না বসে, আমি চলব বাহিরে" অথবা "পরাণ বঁধুরে, দিনে দিনে জন যে চলে যায় !" জীবনে মর্মান্তিক সত্য হল "আর সময় নাহি রে" ! তাহলে মন ছুটোছুটি করলেও নিয়ম করে, জোর করে বসে পালিয়ে যাওয়া মনকে যদি নিমেষের জন্য শ্রীগুরুগোবিন্দের পায়ে নিয়ে ফেলা যায় জপ সহ—সেটাতেই অনেক বেশী লাভ নয় কি ? মন যতই চঞ্চল হোক না কেন, তার চঞ্চলতা উপেক্ষা করে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে—

সাধনে এগুতে হয় যে যদি একবার মন প্রাণ দিয়ে মন মাধবে তাঁর চরণে নিজেকে আহুতি দেই, নিশ্চয় তা সহস্র গুণে ফলদায়ক হবে। তিনি যে সবই দেখছেন মনের চঞ্চলতাও দেখছেন, আবার কতবানি "হরি দে লাগি রহো যে ভাই" করছ তাও দেখছেন। তাই ত তাঁর এক নাম ভাবগ্রাহী জনার্দন!

চলতি ভাষায় যে কথা সুখশ্রাব্য নয়, তাই কুকথা। মন একেবারে "কুকথার পঞ্চমুখ,...কণ্ঠ তথা বিষ" যেন মনের আর একটি কুকথা হল সাধকের অন্তরে এই রকম একটা ভাবনা জাগানো—আমি ত গৃহী, বিষয়ের মধ্যে কামক্রোধাদি ষড়েন্দ্রিয়ের বাঁধনে বদ্ধ হয়ে পড়ে আছি, অন্যান্য মার্গে কি করে এগোতে পারব, সে তাঁরাই পারেন যাঁরা সংসার ত্যাগ করে অরণ্যচারী হয়ে সাধনভজন করছেন। শোন মনের কথা! মন যত চালাকীই করুক না কেন, বোধ হয় সে ভুলে গেছে যে আমাদের মধ্যে ভগবান বিচারবুদ্ধি বলে একটা জিনিষ দিয়েছেন। অতএব হে গৃহী, প্রয়োগ কর তোমার বিচার বুদ্ধি। কি পেলে তবে? জনবে সেই বুদ্ধি বলছে সবই যদি ভগবদিচ্ছায় হয়ে থাকে তবে ত্যাগী তাঁর যেমন সৃষ্টি, গৃহীও ত তেমনই তাঁর সৃষ্টি। নইলে পৃথিবীতে ত হয় শুধু ত্যাগী, নয় শুধু গৃহীই থাকত! আরও ভেবে দেখ, গৃহীর পক্ষে ভগবৎ লাভ যদি এত অসাধ্যই হ'ত তবে ভগবান যুগে যুগে যুগে যুগে গুরুদেহ আশ্রয় করে প্রকট লীলায় গৃহীদেরও তাঁর পায়ে টেনে নিতেন না নিশ্চয়। আমাদের পরমারাধ্য শ্রীগুরুর কথাই ধরি। তিনিও ত দুষ্করতপস্যা লব্ধ, অনন্ত কোটি জন্মের বন্ধনছিন্নকারিণী, মোক্ষমুক্তিপ্রদায়িনী সাধন শক্তি অন্তরে নিলিয়ে যাচ্ছেন যেমন ত্যাগীকে, তেমনই গৃহীকে। মনে যদি তাঁকে পাবার প্রবল বাসনা জাগে "কৃপয়া কেবলমাত্মসাৎ কুরু" এই অভীপ্সা যদি লেলিহান হয়ে ওঠে হৃল্লোকের পানে, তবে কি বিষয়বাসনামলিন গার্হস্থ্য জীবন ত পথের কোনও কাঁটাই হতে পারে না, ত্যাগে ভোগে তখন একাকার হয়ে যায়। ভেবে দেখ, কিভাবে ত্যাগ ও ভোগের প্রত্যন্ত সীমারেখাটি ঘুচে গিয়েছিল রাজর্ষি জনকের মনে।

এতেও নিষ্কৃতি নেই, মন দেখ আবার আর এক ভাবনা নিয়ে হাজির হল সাধকের কাছে। মন যেন বলে চোখে দিল আঁধার নামিয়ে—সাধক ভাবলেন, ভগবান আমায় কত দুঃখ দিচ্ছেন, অন্যকে ত যেন না? কেন এ পক্ষপাত? যদিও মহাপুরুষেরা সুখদুঃখাদি সবই কর্মজনিত ফল বলে থাকেন, আপাততঃ তার কথা বলছি না, কারণ তুমি তখনই বলবে "পূর্বজন্মে আমি কি করেছি তা আমি কি জানি" অথবা হয় ত বলবে—"আমি কি পূর্ব জন্মে শুধু পাপ ছাড়া আর কিছু করি নি" অথবা এ কথাও বলতে পার—"তোমরাই ত বল ভগবান সব করাচ্ছেন, তবে আমার কর্মফলের জন্য আমি দায়ী হব কেন?" তুমি বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ কর। তবে ত, মন যতক্ষণ নির্মল না হচ্ছে, স্থির বুদ্ধি উপজাত হয় নি, ততক্ষণ জন্য কোনও মত মন দিয়ে কি ভগবানের কাজের বিচার করা যায়? যখন সুখে থাক, তখন যদি এ কথা বল কপালে সুখ থাকলে তা কি কেউ কি দাবোধ করে কেড়ে নিতে পারে? তবে এ কথা ভাব না কেন, কপালে দুঃখ থাকলে তা কি কেউ কেড়ে নিতে পারে? বস্তুতঃ সুখ বা দুঃখ কোনওটাই ত অবিমিশ্র হয়ে আসে না সাংসারিক দুটী ভঙ্গীতে কখনও ভাল কখনও মন্দ, এই ত হয়। কর্মপাশ ছিন্ন না হলে মোক্ষলাভ হয় না আর কর্মপাশ ছিন্ন হয় শুধু ভোগের দ্বারাই। কাজেই দুঃখ যদি আসে, তার তীব্রতা হ্রাসের জন্য ভগবানের কাছে আন্তরিক প্রার্থনা করাই শ্রেয়, কারণ দুঃখের তীব্রতায় ভগবানের উপর পক্ষপাতের দোষ আরোপ করলেও ত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না। সাধনের দ্বারা দুঃখের উপরে উঠতে পারলে তবেই তার তীব্রতা হ্রাস করা যায়। তা ছাড়া দুঃখ নিজ কর্মের বা অজ্ঞানতার ফলে সৃষ্টি হয়, এ কথাও ত সত্য।

মনের স্বরূপের বা বিবর্তনের আরও কথা আছে। তবে এখানে সে সবের উল্লেখ করলে পাঠকের মনই হয় ত বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। কাজেই প্রবন্ধে উপসংহার করছি। আসল কথা হল মনের স্বাভাবিক বৃত্তিই যেখানে বিপরীত পথে চলা; সেখানে বিচার বুদ্ধি প্রয়োগে তাকে সংযত বা নিয়ন্ত্রিত না করলে সাধনা সুনিশ্চিত হওয়া অবধারিত।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ

শ্রীবর্দ্ধদাস দাস

শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয় সংহিতোপনিষৎ বা ঈশোপনিষৎ, সংসারের উপর অনাসক্তি ও বৈরাগ্য উৎপাদন করিবার জন্য উপদেশ করিয়াছেন। উহার প্রথম শ্লোকে বলিয়াছেন,

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।

অন্বয়ার্থঃ—এই সমস্ত বিশ্বই ঈশ্বরের আবাসভূমি; তিনিই ইহাতে স্থিতিশীলতত্ত্ব। জগতে যাহা কিছু আছে তৎসমস্তই গতিশীল বা অস্থায়ী। এই কারণে আসক্তিহীন হইয়া ভোগ করিবে। কাহার ধনে লোভ করিও না।

তাৎপর্য্য এই যে এই জগতে যাহা কিছু পরিদৃশ্যমান তৎসমস্তই অনিত্য ক্ষয়শীল, যাহা কিছু সবই নশ্বর এবং ঈশ্বরই একমাত্র স্থিতিশীল বস্তু। এই সমস্ত নশ্বর বস্তুকে জড়াইয়া ঈশ্বর জগতব্যাপী ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। অনিত্য বস্তু ক্ষয়শীল বলিয়া তাহা জীবের আনন্দের কারক হইবে না এবং সেই বস্তুর প্রতি আসক্তচিত্ত হইলে পর তাহার বিয়োগে দুঃখ ঘটিবেই। তাহাতে জীবকে তাহার বিয়োগজনিত অনুতাপ ভোগ করিতে হইবে। কাজেই আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক জাগতিক ভোগ্যবস্তুকে ভোগ করিবে। যেহেতু সকল বস্তুই অনিত্য, কাজেই কোন ভোগ্য বস্তু যাহা নিজের জন্য নয়, সেই বস্তুর প্রতি লোভ করিবে না।

এই শ্লোকে তিনটি পৃথক্ পৃথক্ স্পষ্ট উপদেশ দান করা হইয়াছে :—

প্রথমতঃ—বিশ্বাস করিতে হইবে ঈশ্বর জগৎ জুড়িয়া আছেন;

দ্বিতীয়তঃ—ভোগাসক্তি ত্যাগ করিয়া ভোগ্য বস্তুকে ভোগ করিতে হইবে;

তৃতীয়তঃ—যাহা নিজের জন্য নয়, সেই সব বস্তুর উপর কোন লোভ করিবে না।

'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' এই পদের ব্যাখ্যা যাহা শঙ্কর-ভাষ্যে দৃষ্ট হয়, তাহা এই :—'এবমীশ্বরাত্মভাবনয়া যুক্তস্য পুত্রাদ্যেষণাত্রয়সন্ন্যাস এবাধিকারো ন কর্ম্মসু। তেন ত্যক্তেন ত্যাগেনেত্যর্থঃ। ন হি ত্যক্তো মৃতঃ পুত্রো বা ভৃত্যো বা আত্মসম্বন্ধিতয়া অন্যাবাদাত্মানং পালয়তি, অতস্ত্যাগে নেত্যেব যেবার্থঃ। ভুঞ্জীথাঃ পালয়েথাঃ এবং ত্যাক্তৈষণঃ সন্ মা গৃধঃ গৃধিমাকাঙ্ক্ষাং মা কার্ষীঃ ধনবিষয়ান্।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য 'সেই পরমাত্মরূপী আমিই এই জগৎ; আমার সত্তাই জগতের সত্তা ভিন্ন আর জগতের সত্তা নাই, এই ভূমিকা অবলম্বনক্রমে ব্যাখ্যা সুরু করেন এবং বলেন,

'উত্তমরূপে যে লোক আপনাকে ঈশ্বররূপ বলিয়া অনুভব করিতে পারে, তাহার আর পুত্র, সম্পৎ বা ধর্ম্মাদি লোকলাভের এষণা বা কামনা থাকে না। সুতরাং তদ্মূলক কর্ম্মেও অধিকার থাকে না। একমাত্র বাসনাত্যাগরূপ সন্ন্যাসেই অধিকার থাকে; তাহার ফলে সেই লোক তখন সন্ন্যাস গ্রহণ করে। অতএব তুমি তাদৃশ ভাবাপন্ন হইয়া সন্ন্যাস দ্বারা আত্মাকে পরিপালন কর। অর্থাৎ জগতের মিথ্যাত্ব ভাবনা দ্বারা আত্মার আত্মত্ব (নির্ব্বিকারত্ব ও সত্যত্ব প্রভৃতি ভাবগুলি) রক্ষা কর। তুমি এইরূপে বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজের কিংবা পরের কাহারও ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না।"

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতভাবাপন্ন হওয়ায় তাঁহার যাবতীয় চিন্তাধারা একই ভাবনায় পরিপুষ্ট; তাই তাঁহার ভাষ্য বিশ্লেষণ একদেশদর্শিতাভাবে দুষ্ট। এই নিবন্ধে তাহার মতবাদ সম্বন্ধে বিতর্কে অবতীর্ণ না হইয়াও প্রত্যয় সহিত বলা চলে যে, অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠাকল্পে বহুপরিকর

হওয়াতেই 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' পাদের ব্যাখ্যায় ভিন্ন অর্থ করা হইয়াছে। কারণ সেখানে 'ভুঞ্জীথা' ক্রিয়াপদের ব্যবহার স্পষ্টরূপেই করা হইয়াছে, সেখানে কর্ম ও ভোগ পরিত্যাগ করতঃ সন্ন্যাসাবলম্বনের ব্যাখ্যা ও চিন্তা বোধহয়। বিষয় ভোগ করার অর্থকে গৌণ রেখে, 'মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্' পাদের অবতারণা নিষ্প্রয়োজন হওয়ায়, সম্পূর্ণ শ্লোকের অর্থ ও তাৎপর্যেরও হানি ঘটে। আচার্য শঙ্কর কর্মত্যাগকেই শ্রেষ্ঠ অবস্থা বলিয়াছেন, কারণ তাঁহার মতে নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিষ্কল ব্রহ্মই হইতেছেন একমাত্র সত্য, আর সবই মিথ্যা, মায়া। কিন্তু বস্তুতঃ শঙ্করাচার্য যাহাকে নির্গুণ ব্রহ্ম বলিয়া দেখিয়াছিলেন, তাহা হইতেছে গীতার অক্ষর পুরুষ এবং তিনি যে মায়াশক্তিকে এই জগতের মূল বলিয়া দেখিয়াছিলেন তাহা হইতেছে গীতাতে বর্ণিত অপরাপ্রকৃতি। শঙ্করাচার্যের মতে মায়ার সহিত যুক্ত যে ব্রহ্ম, তাহা সগুণব্রহ্ম, তাহাই গীতার পুরুষোত্তম। ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা, তাঁহার নির্গুণ ব্রহ্মের নীচে। গীতার পুরুষোত্তমের সন্ধান হয় তো শঙ্করাচার্য করেন নাই। উপনিষদ বলিয়াছেন ব্রহ্ম সগুণ নির্গুণ দুইই—সগুণ ও নির্গুণ—এই দুই ভাব নিয়াই পরব্রহ্ম। শঙ্করাচার্য ব্রহ্মের নিষ্ক্রিয়তার দিকটাই দেখিয়াছেন, শক্তি তথা সক্রিয়তার দিকটা অবলোকন করেন নাই, সেইটিকে মায়া বা মিথ্যা বলিয়াছেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে ঈশোপনিষদে যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে। উহার প্রথম দুই শ্লোকে সংসারের উপর অনাসক্তি ও বৈরাগ্য উৎপাদন করার জন্য 'ঈশোপনিষদ' এই উপদেশ করিয়াছেন যে, জাগতিক বস্তু সকলের অনিত্যতা সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণা হওয়া চাই। জগতে ক্ষিতিশীল নিত্যবস্তু একমাত্র পরব্রহ্ম আছেন জানিয়া তাহাতেই মন নিবদ্ধ করিতে হইবে। এইরূপ করিয়া শাস্ত্রবিহিত কর্ম সম্পাদন করিতে হইবে এবং কোন বস্তুর উপর লোভ করিবে না। সর্বপ্রকারে কর্মত্যাগ এই মন্ত্রের অভিপ্রেত নহে।

উদ্ধৃত শ্লোকে 'ভুঞ্জীথাঃ' ক্রিয়াপদের তাৎপর্যানুবাদ "ভোগ করাই" নির্দেশ করে এবং উপনিষদের বাণীর তাৎপর্য গীতার ভাষ্যেও তাহা সমর্থিত; কারণ গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী ভগবদ্ভক্ত বুদ্ধি সর্বতত্ত্ববেত্তা ত্রিকালদর্শীদের কাছে, তাহা পরম উপাদেয়।

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থ বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।

গীতার অধিকর্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ অর্জুনকে বলিতেছেন—

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ। ১৫।১০

অন্বয়ার্থ:—দেহান্তর গমনকারী স্থিতং দেহে অবস্থিত হইয়া গুণসমূহের আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক বিষয় ভোগকারী জীবকে, মোহাচ্ছন্ন (অবিবেকী) পুরুষগণ দেখিতে সমর্থ হন না; যাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়াছে ঈদৃশ বিবেকী পুরুষগণই সেই জীবকে দেখিতে সমর্থ হন।

উক্ত শ্লোকে 'ভুঞ্জানং' শব্দে উহাই অভিহিত করা হইতেছে যে জীবদেহ স্বাভাবিক অবস্থায় সত্ত্বাদি গুণত্রয় কালে সুখ ও দুঃখের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়। যতক্ষণ জীবদেহে থাকিবে, ততক্ষণ 'অন্যোন্যাভিভবাশ্রয়জনন মিথুনবৃত্তয়ঃ' দোষে দুষ্ট ও ক্লিষ্ট হইতে থাকা। অনাদিকাল হইতেই গুণত্রয়ের এইপ্রকার অনিবার্য প্রভাব জীবকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতেছে, তবে তাহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যই উপনিষদে যে উপদেশ দান করা হইয়াছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতেও তাহার অনুরূপ গতির সন্ধান বিভিন্নভাবে নির্দেশ দিয়াছেন এবং প্রিয় সখা অর্জুনকে এই বিষয়ে বলিতেছেন;

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে। ১৪।২০

অন্বয়ার্থ:—সত্ত্ব, রজঃ তমঃ—এই গুণত্রয় জন্মমরণের হেতু। যিনি এই গুণত্রয় পরিহার করিতে পারেন, তাহাকে জন্ম-মৃত্যুর বশীভূত হইতে হয় না। গুণসম্বন্ধরহিত হইতে পারিলে, জীব এই দেহসত্ত্বেই পরমানন্দস্বরূপ অমৃত লাভ করিতে সমর্থ হয়।

হরিদ্বার কুম্ভমেলায় যখন যাচ্ছিলাম

শ্রীদেবেন্দ্র কুমার পালচৌধুরী

তীর্থ পরমাত্মার বিশেষ প্রকাশস্থল বলে মানুষ তীর্থের প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে থাকে। পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য জাতীয়ই তীর্থক্ষেত্র বিদ্যমান। অনিত্য দুখে ময় সংসার-প্রবাসী মানুষের পুনঃ পরমাত্মাতেই ফিরে যেতে হয়। তাই ভাগ্যবান মাত্রেই পরমাত্মা তীর্থের পথে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সন্ধান করে থাকেন। তীর্থ পরমাত্মা ও জীবাত্মার মিলনভূমি। জীব মাত্রই অপরাধ প্রবণ। তীর্থে গমনপূর্বক তীর্থতা দ্বারা সে নির্মলত্বপ্রাপ্ত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত-১ম স্কন্ধ দশমোঽধ্যায়ে উক্ত আছে যে পিতৃ অবস্থানকারী মহারাজ কার্তবীর্যার্জুনকে হত্যা করে পরশুরাম পিতৃ-সন্নিধানে আগমন করিলে পিতা জমদগ্নি তিরস্কার করে পুত্রকে বললেন—

রাজ্ঞো মূর্দ্ধাভিষিক্তস্য বধো ব্রহ্মবধাদ্ গুরু।
তীর্থসংসেবয়া চাংহো জহ্যাস্তাচ্চোত্তমশ্লোকঃ॥

হে পুত্র! অভিষিক্ত সার্বভৌম রাজার বধ ব্রহ্মবধ হতেও গুরু অর্থাৎ অধিক পাপজনক। অতএব তুমি ভগবানে চিত্ত সমাহিত করে তীর্থ পর্যটনের দ্বারা সেই পাপ দূর কর। ব্রহ্মর্ষি জমদগ্নির উক্তি থেকে তীর্থের পাবনীশক্তির সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। মহাভারতের বনপর্বে দ্বাদশবৎসর বনবাসকালে পাণ্ডবদের তীর্থদর্শনের বহু কথাই পরিবেশন করে গেছেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঋষি। ভগবান সঙ্কর্ষণ এবং অভিশপ্ত ধর্মবিদুর এতদুভয়ের তীর্থ গমনকালেই কুরুক্ষেত্র মহাসমর সংঘটিত হয়েছিল তাঁদের অজ্ঞাতে। ভগবান তথাগত তীর্থভূমি গয়ার উরুবিল্বকেই তাঁর তপস্যাক্ষেত্র বলে নির্বাচন করেছিলেন। সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীক্ষেত্রকেই বেছে নিয়েছিলেন হরিনাম প্রচারের জন্য। মানুষের সঙ্গে তীর্থদেবতার যে সম্পর্ক সেটা জয়ের নয়, পরম্ভ ভালবাসার এর পরিচয় পাওয়া যায় এসব তথ্য পর্যালোচনার দ্বারা।

ঋষিরা তপস্যা দ্বারা পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁদের প্রসাদাৎ ভারতবর্ষে এমন সব তীর্থের উদ্ভব হয়েছে যে, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সেখানে সকলেরই সম্মিলন হতে কোন অসুবিধা নাই। কুম্ভমেলাদি হচ্ছে সে সব তীর্থেরই অন্তর্গত। পুরাণসমূহে যে ঋষিভারতের আলেখ্য মনশ্চক্ষে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে সেই ঋষিভারত আজও যে বিদ্যমান, সেটা যে রূপকথা নয়, কুম্ভমেলাদিতে যাঁরা গমন করেছেন তাঁরা অবশ্যই সেকথা স্বীকার করবেন। কাল এর উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, পারবেও না। ভারতে শাসনযন্ত্রের কত হাত বদল হয়েছে, সমাজ ও সভ্যতার ঘটেছে কত রূপান্তর, কিন্তু ঋষিভারতের উপর এর কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। কুম্ভমেলায় গমনেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। আমন্ত্রণহীন এই ঋষি সম্মেলন। যাঁরা ঋষিভারত প্রত্যক্ষ করতে চান তাঁদের একবার কুম্ভমেলা পরিদর্শন করতে হয়। মনে হবে যেন কল্পনার শান্তিময় যুগে ফিরে গেছি। তপস্যা দ্বারা পবিত্রীকৃত সেই পুণ্য সম্মেলনে কত বিচিত্র প্রকারের কঠোর তপস্বী দৃষ্ট হয়, এদের দেখলে যারা দেহাত্মবাদী তারা বিস্মিত না হয়ে পারে না। দেহ যে আত্মা নয়, দেহাভ্যন্তরে যিনি আছেন বলে দেহের অস্তিত্ব বিদ্যমান, সে সব তপস্বীদের দর্শনে সেটা প্রত্যক্ষ করা যায়। দেহেতে আত্মবোধের ফলে পৃথিবীতে নিত্য নিত্য কত নিষ্ঠুর অধর্মাচরণই না অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেটা বলে শেষ করা যায় কি?

সে কথা থাক। সেবার (১৩৫০ বাংলার) হরিদ্বার কুম্ভমেলায় যাচ্ছিলাম। লৌকিক জগতে অনেক সময়

যেখা যায় বাস্তবতার বস্তুপুঞ্জ যখন মানুষের জীবনের পরিধিকে ঠেকে ফেলে তখন মুক্তির জন্য মানুষ অলৌকিকের প্রতি কিছুটা আসক্তিপরায়ণ হয়ে উঠে। লৌকিক ও অলৌকিকের সংমিশ্রণেই ত জীবন সুন্দর। দেবাংশের তীর্থ যেবতাত্ত্বে আহ্বানটি আমার কাছে কিছুটা অলৌকিক বলেই মনে হয়েছিল। মাত্র মাস কয়েক পূর্বে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলাম। কুরুক্ষেত্রের অনন্তায় পথে পা টিপে টিপে চলেছি তখন। একটি ভ্রাতুষ্পুত্রী (গৌরী) ও ও একটি ভ্রাতুষ্পুত্র (শঙ্কর) আমার সঙ্গে তখন তেজপুরে থাকত। ইচ্ছা ছিল যদিও, তবু তাদের নিয়ে সুদূর হরিদ্বার তীর্থে যাত্রা সাধ্যাতীত ব্যয়সাপেক্ষ বলে তাদের যাওয়া বাতিল করা হল। গৌরীর ইচ্ছা সে সময়টা গোয়ালপাড়া জেলার কোকরাঝার শহরে তার সহপাঠী নমিতা ঘোষের বাসায় কাটিয়ে যেয়। ভেবে দেখলাম প্রস্তাবটা মন্দ নয়। সেখানে আমার অনুপস্থিতিতে সে আনন্দেই থাকবে। শঙ্কর তাকে রেখে আসবে নমিতাদের বাসায়। তৎপর সে ফিরে যাবে তার বাপমার কাছে। আমাদের যাত্রাপথেই পড়ে কোকরাঝার অতএব আমরা একসঙ্গেই যাওয়া-আসা করব স্থির করলাম। এসব ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলা হলাম বলে মনে হলেও চাপ আমার রয়েই গেল। ভেবে দেখলাম আমি স্বাধীন নই। শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ একদা আমাকে ৺বৃন্দাবনবিহারীর পায়ে সমর্পণ করে দিয়েছিলেন। সে আজ থেকে প্রায় কুড়ি বৎসর আগেকার কথা। ৺ঠাকুরজীর ব্যবস্থা কি হবে? এবার তীর্থ পর্যটনে ৺ঠাকুরজীকে সঙ্গে নিয়ে যাবার ইচ্ছা আমার আদৌ নাই। অবশেষে গৌরীই ৺ঠাকুরজীকে সাথে রেখে সেবার ভার গ্রহণ করায় আমি নিশ্চিন্ত হলাম। বলাবাহুল্য গৌরী বাবাজী মহারাজেরই কৃপাপ্রাপ্ত। কোন অসুবিধাই হবার কথা নয়। কিন্তু তীর্থনিস্ত ঠাকুর আগেভাগেই বড়যন্ত্র করে বসে থাকবেন সে কথা কে জানত? সেদিন তাঁকার ঠাকুরজী যে ধাক্কা সৃষ্টি করেছিলেন কৌতূহল নিবারণের জন্য ঘটনাটি এখানে না বললে নয়।

শিলচর থেকে গুরুভ্রাতা সন্তোষদত্ত বাবুর পরিচালনায় নয়জন গুরু ভ্রাতা-ভগ্নীর একটি দল গৌহাটি পৌঁছে আমার জন্য প্রতীক্ষমান থাকবেন এবং আমি তেজপুর থেকে ওখানে হয়ে তাঁদের সহিত গৌহাটিতে মিলিত হব এই ছিল সন্তোষবাবুর সহিত আমার টেলিগ্রাম বিনিময়ের মর্মকথা। সন্তোষবাবু গৌহাটি থেকে আমাদের সকলেরই রিজার্ভেশন করে রেখেছিলেন। আমি যথাকালে ঠাকুরজী, গৌরী ও শঙ্কর সহ গৌহাটি পৌঁছে সন্তোষবাবুদের সহিত মিলিত হলাম। সেদিন আমরা রওনা হয়ে হরিদ্বারের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম সে দিনটি ছিল ১৯৭৪ ইংরেজীর ১লা এপ্রিল। সেদিন গৌহাটি-বঙ্গাইগাঁওএর মধ্যবর্তী কোন স্থানে একটা ট্রেণ Derailed হওয়ায় আমাদের অল্পটুকু স্থানের মধ্যে দুদুবার transhipment করতে হয়। সর্বমোট এগারোজন যাত্রীর মালপত্র লটবহর একেবারে কম ছিল না। শঙ্কর সাথে থাকায় সবদের পক্ষে খুব সুবিধা হল। তখন রাত্রি কাল। মালপত্র নামানো উঠানো ব্যাপারে শঙ্করের সময়োপযোগী সেবা ও সাহায্য সকলকেই মুগ্ধ করেছিল। আমরা নিশ্চিন্তে লাফো বেরিয়ে উঠে স্ব স্ব স্থান গ্রহণ করলাম গাড়ীতে ভীড়ের চাপ খুবই। তুপ তুপ আমাদের জিনিষপত্র সে রাতে সনাক্ত করে গোছগাছ করা কারও পক্ষে সম্ভব হল না। রাত্রির অন্ধকারে গাড়ী দ্রুত ছুটে চলেছে। বঙ্গাইগাঁও থেকে কোকরাঝার মাত্র দুটা ষ্টেশনের ব্যবধান। ঠাকুরজীকে নিয়ে গৌরী ও শঙ্কর ওখানেই ও নামবে। সময় কমে আসছে। আসন্ন বিচ্ছেদে মনটা বড়ই বিষন্ন হয়ে পড়ল। উভয়কে দুই একটা প্রয়োজনীয় উপদেশের কথা বলছি। ওদিকে গৌরী ও শঙ্করের কাপড়চোপড়ে ভর্তি ব্যাগ দুটা গোছাই করা মালের মধ্যে কেবলি চলেছে খোঁজাখুঁজি। Transhipmentএর জন্য রাত্রি অধিক হয়ে গিয়েছিল। এত রাত্রে কোকরাঝার নেমে এরা বাসায় পৌঁছবে কি করে? কোকরাঝার একটা গ্রাম্য শহরের মত স্থান। এত রাত্রে রিকশা পাওয়া কঠিন। মনটা কেবলি অস্থির-পনা করতে লাগল। গাড়ী কোকরাঝার পৌঁছতে আর বিলম্ব নাই। কিন্তু গৌরীর ব্যাগটা এখন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কি হবে তবে? মনের উচাটন বেড়েই চলেছে। এমন সময় গাড়ীর যাত্রীদের মধ্যে কে

একজন বলে উঠল কোথায় বলছেন—কোকরাঝার? সেটাত কখনই শেড্যুলে ফেলে এসেছি। স্তম্ভিত হয়ে গেলাম কথাটা শুনে। অবশেষে সতীশ দত্তবাবু আরম্ভ করে বললেন, এদের ভাগ্যে আছে তীর্থযাত্রা, চিন্তার কি আছে! এরাও কুম্ভমেলায় ঘুরে আসবে। কথা শুনে বাকুসে শান্তিঠাকুরজী মনে মনে আমোদই পাচ্ছিলেন বোধ করি। কোকরাঝাড় নামার কথা কিন্তু তিনি যে আগেভাগে লাক্সোর গাড়ীতে চড়ে আছেন। ঠাকুরজী একাই যে ছবিয়াদের সঙ্গী হলেন তা নয়, আরও দুটি বালক বালিকাকে সঙ্গী জুটিয়ে আমার প্রাক্তন ব্যবস্থাকে বানচাল করতে তাদের চাপ আরও বাড়িয়ে দিলেন। এত করেও আমার প্রতি ঠাকুরজীর অভিমান দূর হল না। আমি তাকে কোকরাঝার পাঠাবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলাম। এত করেও আমার প্রতি ঠাকুরজীর অভিমান দূর হল না। আমি তাঁকে কোকরাঝার পাঠাবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলাম। আমার অপরাধ গুরুতর। তজ্জন্য কিছুটা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করলেন। ব্যাগভর্তি সৌখীন জামা কাপড় শাড়ি এবং মৎপ্রদত্ত হাতখরচ বাবদ একশত টাকা সৌরী যা ব্যাগে রেখে দিয়েছিল, সে ব্যাগটা যে কোথায় অন্তর্ধান হয়ে গেল তার টিকিরও সন্ধান পাওয়া গেল না।

বাড়ি পরিত্যক্ত হলে সত্য যেমন ম্যালেরিয়া প্রাপ্ত হয়ে নয়ন পরিতৃপ্ত করতে পারে না, তেমনি চলতি পথের ঘটনা-বৈচিত্র্যও হয়ত পরিত্যক্ত হলে সেটা সৌষ্ঠবহীন হয়ে পড়ে। পাঠকের কৌতূহল তৃপ্ত করতে সমর্থ হয় না। তীর্থযাত্রার পথে 'ছিনতাই' তেমনি একটা ঘটনা যা না বললে নয়। সতীশ দত্তবাবু রিজার্ভেশন করেছিলেন একথা পূর্বে বলেছি। মার্চের রিজার্ভেশন, এপ্রিলে ছিল যাত্রার দিন। কিন্তু পহলা এপ্রিল থেকে গাড়ীর ভাড়া এবং নিয়ম কানুনের আকস্মিক অমল বদলের অজুহাতে যথাকালে সেই রিজার্ভেশন বাতিল হয়ে যায়। রিজার্ভেশন পুনরুজ্জীবনের চেষ্টার ত্রুটি হল না। কিন্তু হাতে সময় তখন খুব কম। সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। তজ্জন্য ঘটনাটা হলের কারও তাতে মনে বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। সেটা বিশেষভাবে প্রকাশ পেল লক্ষ্ণৌ পৌঁছে। সতীশদেব কলকাতার সতীশদেব বাবু অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারী। লক্ষ্ণৌ থেকে রেলপথে হরিদ্বার খুব একটা দূরবর্তী না হলেও তিনি ভীড়ের চাপ সহ্য করতে না পারায় লক্ষ্ণৌ পৌঁছে রিজার্ভেশনের চেষ্টায় পুনঃ প্রবৃত্ত হলেন। আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় বিশ্রাম করছিলাম। মধ্যাহ্ন আহারের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল সতীশদেববাবু প্রত্যাবর্তন করলেন না। আমরা তাঁর অনুসন্ধানে বহির্গত হয়ে বুকিং অফিস ও তৎসন্নিহিত স্থানে বহু খুঁজাখুঁজি করিলাম। কিন্তু তাঁকে দেখতে পাওয়া গেল না। আমরা সকলেই উদ্বিগ্ন হলাম। এদিকে জঠরজ্বালায় সকলেই তখন অস্থির। কি আর করা যায়! আমি ছাড়া সকলেই রেলওয়ে হোটেলখানায় জঠরজ্বালা নিবৃত্তি করলেন। অবশ্য আমি আমার পূর্বপরিচিত 'বেঙ্গল হোটেলে' আহার করলাম। আহার পর্ব সমাপ্ত হলে গভীর উদ্বেগ সহকারে সকলেই বলাবলি করতে লাগলেন। দেববাবুর ওপরে বহির্গত হলাম। লোকটি গেলেন কোথায় সকলের মনেই তখন এক প্রশ্ন। হঠাৎ আমাদের বিপুল আনন্দ বর্ধন করে অল্পক্ষণের মধ্যেই প্লেটফরমে ওভারব্রিজে অন-সমুদ্রে তিনি সকলের নয়নগোচর হলেন। চৈত্রে লক্ষ্ণৌর আকাশে তীব্র ভয়ানক তপ্ত। সেই তপ্ত রৌদ্রে দেববাবু বিদ্রান্তের মত কাকে যেন খুঁজাখুঁজি করছেন। আমরা নিকটবর্তি হতেই বলে উঠলেন, সর্বনাশ হয়েছে। টাকা ছিনতাই হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ অপরিচিত ভদ্রবেশী জনৈক বয়স্কজন অকস্মাৎ তাঁর কাছে এসে বলে "আপনি সৌহাটি থেকে আসছেন না? আপনি সৌহাটির অমুক অমুককে চিনেন কি? আমিও সেখান থেকেই এসেছি, কুম্ভমেলায় যাব।" পূর্বেই বলেছি দেববাবু রেলওয়েতে চাকুরী করতেন, হেড বুকিং ক্লার্কের চাকুরী থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেছিলেন। সৌহাটিতে কিছু সংখ্যক লোক তাঁর পরিচিত থাকা খুব স্বাভাবিক। পরিচয়ের ছদ্মবেশধারী লোকটা তাঁর বিশ্বাস উৎপাদন করতে আশ্চর্য কিছু নয়। সতীশ দেব বাবুকে রিজার্ভেশনের কাটটায়ে ঘুরা-ফেরা করতে দেখে বুঝতে পেরেছিল তাঁর রিজার্ভেশনের প্রয়োজন। দেববাবু এখনে বৃদ্ধ হয়েছেন। কাজেই বৃদ্ধের প্রায় অপলোভন করে পুরোপকার সাধনের

এমন পুণ্য সুযোগ আর কখন? সে সহজেই ডিজার্ভেশন করে দিতে পারবে বলে দেববাবুকে কেবলি আশ্বাস দিতে থাকে। সরল প্রাণ দেববাবু সন্দেহাতীত হয়ে সেই মনিব্যাগ থেকে টাকা বের করেছেন, অমনি ক্ষিপ্রগতিতে সে দেববাবুর হাত থেকে টাকা তুলে নেয়। যাবার সময় বলে যায় "মানিব্যাগটা পকেটে সাবধানে পুরে রাখুন, আজকা ভাল নয়।" তৎপর থেকে লোকটার আর দেখা নাই। কুম্ভমেলার দিনে লক্ষ্ণৌর মত বৃহৎ জংশনে যাত্রীসমূহে মনুষ্য বেশধারী যে চাষর, কে কুম্ভীর, কে বা ক্রুর সর্প আমার কে-ই বা মহান্ত মহান সজ্জন সনাক্ত করার জো আছে কি? দেববাবুর তখনকার দারুনার প্রলেপ ভিন্ন অন্য কিছু দিবার মত কেহই বোধ হয় তখন সমর্থ ছিল না। গাড়ী লক্ষ্ণৌ ছেড়ে চলে গেল। অবশেষে সে রাতেই আমরা পেসেঞ্জার গাড়ীতে উঠতে সক্ষম হলাম।

৪ঠা এপ্রিল। ভাবাভাড়ার অতিরিক্ত দিয়ে আমাদের মালপত্রসহ গাড়ীতে উঠিয়ে দিবার প্রতিশ্রুতিতে কুলিভাড়া করা হল। ট্রেন এক্সপ্রেসের জন্য সারারাত অপেক্ষা করে বসে আছি। অপরাহ্নে বোকাই বোকাই সাধুসন্ত নিয়ে ভরপুরির মধ্যে ট্রেন এক্সপ্রেস লক্ষ্ণৌ জংশনে এসে প্রবেশ করল। গাড়ীর ভিতরে এবং ছাদে তিল ধারনের স্থান নাই। তুলি বার বার প্রয়াস করে হাল ছেড়ে দিল। অবশেষে সে রাতেই আমরা প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে উঠতে সক্ষম হলাম।

৫ই এপ্রিল বেলা ১১।০টায় হরিদ্বার এসে পৌঁছলাম। হরিদ্বারে এসে পৌঁছলেই হরিদ্বার পৌঁছান হয় না। সমস্যা অনেক। আমি পূর্বেই বলেছি ঠাকুরজী একক আসেন নি। আরও দুটি বালক-বালিকাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। বস্তুতঃ এদের তীর্থযাত্রা যেমন ভগবৎ ইচ্ছাধীন ঘটনা, তেমনি ভ্রমণও ঈশ্বরের কৃপার উপরই ছিল নির্ভরশীল। গৌরী ও শঙ্করের টিকেট ছিল না। সাধ্যও ছিলনা। একার খরচের অর্থ নিয়েই যাত্রা করেছিলাম। এদের হাতখরচ বাবদ যে একশত টাকা দিয়েছিলাম গৌরী তার ব্যাগে পুরে রেখে দিয়েছিল। আর সে ব্যাগ হারাবারই বোঝা দিয়েছিল। মানুষের যখন সর্ব অবলম্বন নিঃশেষ হয়ে যায় তখন শ্রীভগবানই একমাত্র শেষ আশ্রয়। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ তাই হয়েছিল। টি-টি-আইরা বরাবরই হানা দিয়েছে। দুরু দুরু বুক। মনে মনে বলছি, ঠাকুর এদের তীর্থভ্রমণ তোমারই ত অভিপ্রেত। আমি ত এদের সঙ্গে আনিনি, তোমাকেও নয়। তুমি নিজেই যখন এসেছ এবং লক্ষী জুটিয়ে অন্য দুটিকেও নিয়ে এসেছ তখন সে ভাবনা তোমার।" টি-টি-আইর গ্রাস থেকে মুক্ত করে তৎক্ষণাৎ প্রদান করেছেন অভয়। কিন্তু এবে চারবার ট্রেন। কুম্ভমেলার যুগ। এদের না আছে কলেরা প্রতিরোধমূলক সার্টিফিকেট, না স্মলপক্সনেশনের নিদর্শনামা। গাড়ী থেকে হরিদ্বারের পুণ্য মৃত্তিকায় পা রাখার পূর্বে শুকরানা করে মনে মনে বললাম- "তুমি বিপদহারী! কিভাবে যে ট্রেন সীমা পার করে দিবে, জানিনা কিছুই।" সকলেই যেমন টিকেট পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে এবং সন্দেহাতীতভাবে গৌরী ও শঙ্কর পার হয়ে এসেছে, এবেলেও তার ব্যতিক্রম হলনা। এ্যানেক্সুলেটারসহের সম্মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসা কালে কেহই যেন তাদের দেখতেই পেলে না।

আমরা দীর্ঘ ভ্রমণে ক্লান্ত, দারুণ গ্রীষ্মে ঘর্মাক্ত, অনাহারে ক্ষুধার্ত। ষ্টেশন থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে সম্মুখবর্তী এক পাঞ্জাবওয়ালার খাবার দোকানে আমরা প্রবেশ করলাম। হাত মুখ ধুয়ে কুন্নিবৃত্তি করে সুস্থ বোধ করলাম। তারপর ছ'খানা রিকসায় একটা কনভয় আমাদের নিয়ে যাত্রা করল ভ্রমবিদেহী ক্যাম্পে নীলধারার মোহনায় কনখলে।

"অজপা যো জপে উস্‌কো পাশ কাল কভী নেহী আওয়ে। কোই সাধু পুছনে সে এ কিসীকো নেহী বোল্‌না।" — শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবা

"ইস্‌মে (বিগ্রহাদি দর্শন) বহুত ফল হ্যায়, পাপ যাতা হ্যায়, আঁখ খুলতা হ্যায় তেজ বড়তা হ্যায়।" শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবা

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ কি জন্মগত অথবা গুণকর্ম্মগত ?

(কোনটী শাস্ত্রসম্মত ?)

ডক্টর অমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য এম্. এ., পি-এইচ. ডি, বেদান্তশাস্ত্রী, কাব্য বেদান্ত-বেদ তীর্থ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অতঃপর প্রাচীনকালে যে জাতিভেদপ্রথা বা চাতুর্ব্বর্ণ্য-বিভাগ প্রচলিত ছিল সেই বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে।

(i) পূর্ব্বে উল্লিখিত ব্রহ্মসূত্রের অপশূদ্রাধিকরণে (ব্র. সূ:. ১।৩ ৩৪-৩৮ সূত্র) জানশ্রুতি রাজার জাতিগত ক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকার করা হইয়াছে এবং শূদ্রের বেদাধিকার নিষেধ করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা সেই প্রাচীনকালেও যে জাতিগত চাতুর্ব্বর্ণ্যবিভাগ ছিল, ইহা প্রমাণিত হয়। (১৬ নং প্যারা দ্রষ্টব্য)

(ii) ছান্দোগ্য উপনিষদে (৫।১০।৭) উক্ত হইয়াছে যে জীব স্বীয় পাপ বা পুণ্য কর্ম্মানুসারে যথাক্রমে চণ্ডাল-যোনি, শূকরযোনি বা ব্রাহ্মণযোনি, ক্ষত্রিয়যোনি, বা বৈশ্য-যোনিতে জন্মপ্রাপ্ত হইয়া থাকে (পূর্ব্বে উল্লিখিত ১৭নং প্যারা দ্রষ্টব্য)। এই বাক্যের দ্বারাও জানা যায় যে সেই বৈদিক যুগে প্রাচীনকালেও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি জন্মগত জাতিভেদ ছিল

(iii) বাল্মীকি রামায়ণে উক্ত হইয়াছে—

" পুরা কৃতযুগে রাজন্ ব্রাহ্মণা বৈ তপস্বিনঃ।
অব্রাহ্মণস্তদা রাজন্ ন তপস্বী কথঞ্চন।
ততস্ত্রেতাযুগং নাম মানবানাং বপুষ্মতাম্।
ক্ষত্রিয়া যত্র জায়ন্তে পূর্ব্বেণ তপসান্বিতাঃ।
মানবা যে মহাত্মানস্তত্র ত্রেতাযুগে যুগে।
ব্রহ্ম ক্ষত্রঞ্চ তৎ সর্ব্বং যৎ পূর্ব্বমৃষয়ঃ কৃতং।
অপশ্যন্তস্ত তে সর্ব্বে বিশেষমধিকং ততঃ।
স্থাপনং চক্রিরে তত্র চাতুর্ব্বর্ণস্য সম্মতম্।।"

উত্তর কাণ্ড, ৭৪ ১-১৫

"ত্রেতাযুগে চ বর্ত্তন্তে ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চ যে।
অপোহতপ্যন্ত তে সর্ব্বে শুক্রমামপরে জনাঃ।
অবর্ষঃ পঞ্চবর্ষেষাং বৈশ্যশূদ্রং তদাগমৎ।
পুজাশ্চ সর্ব্ববর্ণানাং শূদ্রাশ্চক্রুর্বিশেষতঃ।

ঐ,৮৪।২০-২১

দ্বিজ্যো যুগেষ্বাদ্যেষু বর্ণান্ ধর্ম্মশ্চ পরিনিষ্ঠিতঃ।
ন শূদ্রো লভতে ধর্ম্মং যুগত্বে নরর্ষভ।
হীনবর্ণো নৃপশ্রেষ্ঠ তপ্যতে তপ উত্তমং।
তস্মিন্নন্ত্যযুগে প্রাপ্তে ভবিষ্যচ্ছূদ্রযোন্যাং হি তপস্তপ্যতি কলৌ যুগে।।"

ঐ, ৭৪।২৯-২৭

ইত্যাদি। —উত্তরকাণ্ড (বাল্মীকি রামায়ণ) ৭৪ অধ্যায়

—অর্থাৎ, প্রথমে সত্যযুগে ব্রাহ্মণেরাই তপস্যায় রত ছিলেন। তৎকালে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতি (অব্রাহ্মণ) কখনও তপস্যাচরণ করিতেন না। তারপর ত্রেতা-যুগ আসিল। সেই ত্রেতাযুগে সুন্দর শরীরধারী ক্ষত্রিয়গণ জন্মগ্রহণ করিল এবং ক্ষত্রিয়গণও সেই রূপ ব্রাহ্মণের ন্যায় তপস্যাচরণ করিতে লাগিলেন। যে সকল মহাত্মা ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয় মানবগণ ত্রেতাযুগে তপস্যাপরায়ণ ছিলেন, তাঁহাদের অপেক্ষা সত্যযুগের মনুষ্যগণ তপোবলে ও বীর্য্যবলে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে তপোবিশেষ দ্বারা ক্ষত্রিয়াপেক্ষা ব্রাহ্মণের বিশেষ আধিক্য (শ্রেষ্ঠত্ব) দেখিয়া মনু প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ সর্ব্বসম্মত বর্ণাশ্রমাচার (চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগ) স্থাপন করিলেন। ত্রেতাযুগে যে সকল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ছিলেন তাঁহারা তপস্যাচরণ করিতেন, আর

অপর বৈশ্য ও শূদ্রেরা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সেবা করিতেন। ইহাই (সেবা কর্ম) তাঁহাদের (বৈশ্য-শূদ্রদিগের) পরম ধর্ম। বিশেষতঃ শূদ্রগণ অপর তিনবর্ণের পূজ্য, আদর-সৎকার করিতেন। ইহাই তাঁহাদের পরম ধর্ম। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর—এই তিন যুগে কেবল ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের আশ্রয় লইয়া তপস্যারূপ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু এই তিনযুগে শূদ্রদিগের তপস্যারূপ ধর্মে অধিকার ছিল না। কিন্তু কলিযুগ আসিলে ভবিষ্যতে শূদ্রযোনিতে উৎপন্ন হীনবর্ণের মনুষ্যগণও তপস্যা করিবেন।

উল্লিখিত শাস্ত্রোক্তিতে ইহা সুস্পষ্টভাবেই উক্ত হইয়াছে যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরযুগেও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এই "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ত্রাপরং", "বৈশ্য-শূদ্রং", "শূদ্রাঃ", "ত্রীণ্‌বর্ণান্," "শূদ্রযোনাং"—প্রভৃতি পদগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সুতরাং প্রাচীনকালেও যে জাতিভেদপ্রথা প্রচলিত ছিল এই সকল বাক্য সেই বিষয়ে প্রমাণ

(iv) বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে যে সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্ম হইতেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র—এই চারিটি বর্ণ এক এক করিয়া সৃষ্টি হইয়াছে এবং সেবে ধর্মও সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের নাম ও তাঁহাদের সৃষ্টি উল্লেখ থাকায় সেই প্রাচীনকালে উপনিষদ্‌যুগেও যে ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদ প্রথা (চাতুর্ব্বর্ণ্যবিভাগ) প্রচলিত ছিল এবং এই জাতিভেদ যে ঈশ্বরসৃষ্ট, মনুষ্যসৃষ্ট নহে ইহা প্রমাণিত হয়। সেই উপনিষদ্‌স্থ শ্রুতিবাক্যগুলি এই, যথা :

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব।...অক্ষত্রমেতদমত্য-সৃজত ক্ষত্রং যান্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণি...বৈশ্যা ক্ষত্রস্য যোনির্যদ্‌ব্রহ্ম।"...স নৈব ব্যভবৎ স বিশমসৃজত যান্যেতানি দেবজাতানি...স শৌদ্রং বর্ণমসৃজত পূষণম্ ...তদেতদ্‌ব্রহ্ম ক্ষত্রং বিট্ শূদ্রস্তদগ্নিনৈব দেবেষু ব্রহ্মাভবদ্ ব্রাহ্মণো মনুষ্যেষু ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যেন বৈশ্যঃ শূদ্রেণ শূদ্রস্তস্মাদগ্নাবেব দেবেষু লোকমিচ্ছন্তে ব্রহ্মণ মনুষ্যেষ্বাত্মান এব ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রঃ।"

(১।৪।১১-১৭)

উক্ত শ্রুতিবাক্যসমূহে মধ্যেরেখাঙ্কিত বাক্যগুলি বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয়। এমন কি ঐ সকল শ্রুতিবাক্যে এইরূপ কথাও বলা হইয়াছে যে দেবতাদিগের মধ্যেও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ আছে। ব্রহ্ম, অগ্নি, বৃহস্পতি, প্রজাপতি প্রভৃতি ব্রাহ্মণবর্ণ, ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জন্য, যম, মৃত্যু, ঈশান,—ইহারা ক্ষত্রিয়; বসুগণ, (অষ্টবসু), রুদ্রগণ (একাদশরুদ্র), আদিত্যগণ (দ্বাদশ আদিত্য), বিশ্বেদেবগণ এবং মরুদ্‌গণ (উনপঞ্চাশ মরুৎ)—এই সকল গণদেবতাগণ বৈশ্যবর্ণ; 'পূষা' প্রভৃতি পোষণকারী দেবতুল্য শূদ্রবর্ণ

(বৃহদারণ্যক উপনিষৎ—১।৪।১১-১। দ্রষ্টব্য)

উপসংহারে বক্তব্য যে উল্লিখিত শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তি-সমূহের দ্বারা ইহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হয় যে ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণ্যবিভাগ জন্মগত বা জাতিগত এবং ঐ জাতিভেদ ঈশ্বরসৃষ্ট, মনুষ্যসৃষ্ট নহে। ঐরূপ চাতুর্ব্বর্ণ্যজাতিভেদ অতিশয় সুপ্রাচীনকালে সত্য, ত্রেতা, ও দ্বাপর যুগেও এবং বৈদিক ও উপনিষদ্-যুগেও প্রচলিত ছিল—ইহাও প্রমাণিত হইল।

অলমতি বিস্তরেণ।

ওঁ সত্যমেব জয়তু ! ! !

"সাধুসঙ্গ চালের জলের মত। চালের জলে নেশা কাটায়। সংসারমদে মত্ত জীবের নেশা কাটাবার একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গ।" —শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

আমি-আমার

শ্রীঅজিত কুমার সেন, এম্.এ.

স্বার্থপরতার লালা দিয়ে লালসার সুতো বুনে
তৈরী আমার ঘর- নাম দিয়েছি "সংসার"
বাইরে তাকাবার ইচ্ছা-রুচি কিছুই নেই
ফুটো প্রমাণ জানলাও তাই রাখিনি।
মুক্ত জগতের হাতছানি আমার বিভীষিকা।
মুক্ত আলোর চিন্তা আমার দুঃস্বপ্ন
মুক্ত বাতাস আমার অসহ্য
আমি খেয়েই চলি,— চললে থামবো না- উড়বো
তখন কি চেহারা হবে জানিনা
উড়ে কোথায় যাবো— তাও জানিনা।
শুধু ভয়, এত সাধের "সংসার" একদিন কেটে যাবে
এত বৈভব, মান, নিশ্চিন্ত আরামের বেসাতী
লালায় সুতোর ঘর
ছেঁড়া কাঁথার মত ফেলে, আমায় যেতেই
হবে, যেতেই হবে।

চির অচেনা

শ্রীমন্মথরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

যত দূরে আমি খুঁজেছি তোমায়
তুমি তত কাছে এসেছ,
চিনিতে পারিনি এ ভ্রম আমার
কত ব্যথা পেয়ে সয়েছ।
দুখের গহন নিশি পারাবারে
হারায়েছি পথ আমি বারে বারে,
বাহিরে খুঁজেছি আলোর নিশানা
তুমি প্রাণে দীপ জেলেছ।

কত যে পিপাসা আশা ও নিরাশা
নিত্য লয়েছি কুড়ায়ে,
তুমি পাশে থেকে গোপনে গোপনে
সকলি দিয়েছ ভুলায়ে।
বড় সাধনার ধন তুমি তাই
কাছে এসে ভয়ে দূরে সরে যাই,
ভুলে যাই তুমি কত ছোট হয়ে
মোরে ধরা দিতে চেয়েছ।

পাশ্চাত্য সভ্যতা বনাম প্রাচ্য সভ্যতা

ব্রহ্মচারিণী শ্রীকল্যাণী দেবী, বেদান্তাচার্য্য

অনন্ত ঐশ্বর্য্যের আধার শ্রীভগবানের সৃষ্টিও অনন্ত। এই বিশ্ব প্রপঞ্চের এই অনন্ত সৃষ্টির মূল কারণই অনন্ত ঐশ্বর্য্যময় অদ্বৈত ভগবানের লীলাবিলাস। শ্রীবেদব্যাস ব্রহ্ম-সূত্রগ্রন্থে বলিয়াছেন "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্" তিনি ক্ষুদ্র, পুনঃ যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে অণুরূপেও তিনিই বিরাজিত; তাঁহারই শক্তিতে পরিচালিত হইতেছে এই প্রপঞ্চ। মানবে তাঁহার প্রকাশ অধিকতম। এইজন্য জীবজগতে মানবই শ্রেষ্ঠজীব বলিয়া পরিচিত। কিন্তু কে জানে আরো কোন উন্নততর সৃষ্টিরহস্যও তাঁহার আছে কিনা? মানবকুল এই পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া আছে। তাঁহাদের চিন্তাধারা, রীতিনীতি, ভাষা ও আশা-আকাঙ্খা পৃথক্ পৃথক্। এই বৈচিত্র্যই ভগবৎসৃষ্টির বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈচিত্র্য হেতুই বিভিন্ন দেশের বিভিন্নপ্রকার সভ্যতার উন্মেষ ঘটিয়াছে।

সভ্যতা বলিতে মানবজীবনের ক্রমবিকাশের পরাকাষ্ঠাকেই বুঝিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে তাহাই বিকশিত হয় যাহার বীজ সূক্ষ্মাবস্থায় ভিতরে বিরাজিত আছে। সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই তিন গুণই রহিয়াছে বিশ্বসৃষ্টিতে; তাই কোথাও সত্ত্বগুণ প্রধান, কোথাও রজোগুণের প্রধান্য আবার কোথাও তমঃ প্রধান উক্ত গুণভেদবশতঃই মানবে বিভিন্ন মনোবৃত্তি। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে যে পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয় তাহারও মূল কারণ ইহাই। ভারতীয় সভ্যতা বলিতে আমরা ইহাই বুঝি যে ভারতভূমিতে সভ্যতার যে বীজ তাহার জল, বায়ু ও আবহাওয়ার সঙ্গে জড়িত আছে,

তাহারই উজ্জীবন। ভারতীয় সভ্যতা বৈদিক সভ্যতা, অধ্যাত্মমার্গেই তাহার স্বাভাবিক গতি। ভারতীয় সভ্যতা শিক্ষা দেয় "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", "অহংব্রহ্মাস্মি", "তত্ত্বমসি" ভোগবিলাসের প্রশ্ন এখানে অবান্তর— "আত্মানং বিদ্ধি", এই মন্ত্রই ভারতীয় ঋষি ও গুরুর মন্ত্র। সত্যকে উপলব্ধি করিতে হইবে এবং সত্যকে উপলব্ধি করিতে হইলে অত্যাবশ্যক নিজেকে জানা। বহির্মুখী ইন্দ্রিয়কে সংহত করিয়া তাহাকে অন্তর্মুখী করিলেই খুলকুণ্ডলিনী হইবেন জাগ্রত। তখন জ্ঞানদৃষ্টি প্রস্ফুটিত হইবে এবং যাহা জানিলে অন্য কিছু আর জানা বাকী থাকে না তাহাই হইবে সুলভ। কি জ্ঞানমার্গ, কি অধ্যাত্ম-মার্গ সকল মার্গের সামগ্রিক বিকাশই ভারতীয় সভ্যতা।

পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহাকে তমোভিত্তিক রজোগুণী সভ্যতা বলা যাইতে পারে। "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ", অর্থাৎ সর্বতোভাবে ইন্দ্রিয়সুখপরায়ণতাই পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল ভিত্তি বাস্তবধর্মী পাশ্চাত্য জগতের অধিবাসী বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা পদার্থ বিষয়ক জ্ঞান সকলে উন্মুখ। শুধু তাহাই নয় তারা চায় যাবতীয় পদার্থকে নিজেদের প্রয়োজন মিটাইতে কাজে লাগাইতে। এই প্রয়োজন কেবল জৈব প্রয়োজন, ভোগ বিলাসের প্রয়োজনের ক্রমবর্দ্ধন। ভারতীয় ঋষি সতর্ক করিয়া দিয়াছেন এই মন্ত্র ঘোষণা করিয়া—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।"

বুদ্ধিজীবী পাশ্চাত্য সভ্যতা ভোগবাদী। তথায় সম্পূর্ণ শক্তিকে নিয়োজিত করা হয়েছে ভোগের পরাকাষ্ঠার দিকে। চতুর্দিকে বিজ্ঞানের জয়জয়কার, এক মুহূর্তও এই কথা ভাবিবার অবকাশ নাই যে কাহার কৃপায় এই বুদ্ধিবৃত্তি যাহা জড়বিজ্ঞানে নিযুক্ত করা হইতেছে। কাহার কৃপায় অসম্ভবকে সম্ভব করা হইতেছে আর ইহার শেষই বা কোথায়? সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা দুইটি ভিন্ন সমান্তরাল ধারায় প্রবাহিত, একের সঙ্গে অন্যের মিলন সম্ভব নয়। ইদানীং পাশ্চাত্যদেশ ভারতীয় অধ্যাত্মবিজ্ঞানের প্রতি অনুসন্ধিৎসু হইয়াছে। ভোগের পথে ভারত লাভবান হইবে এ আশা করা বৃথা। ভারতীয় সভ্যতা ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত, ত্যাগের মহিমায় ভারতীয় সভ্যতা সমুজ্জ্বল। শ্রীমদ্ভাগবদগীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহংকারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি।"

"শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্।"

মনীষীগণও শেষ পর্যন্ত দিব্য জীবনের মূলমন্ত্র খুঁজিয়া পাইয়াছেন—

"Plain living and high thinking"

গ্রন্থপরিচিতি ও সমালোচনা

Nikhil Banga Sanskrit Sevi Samiti
4A, D. L. Roy Street
Calcutta-6
১৫৩-৯ই জ্যৈষ্ঠ
২০।৫।৭৬

পরম ভক্তভাজন—ভাগবতোত্তম –

শ্রীমান্ ললিত কুমার বসু

শ্রীশ্রীগুরুগতপ্রাণেষু·

শুভাশংসাপূর্বক বিজ্ঞাপনম্

গুরুভক্ত শ্রীমান্ ললিতবাবু! আপনার প্রেরিত ব্রজ-বিদেহী মহন্ত ও বৈষ্ণব চূড়ামণি সম্প্রদায় শ্রীমহন্ত শ্রী১০৮ শ্রীমৎ স্বামী ধনঞ্জয়দাসজী কাঠিয়া বাবা (ভক্তভক্তব্যাকরণতীর্থ) মহারাজের "জীবনদর্পণ" অবলোকন করিলাম। নানা বর্ণে নানা বনে কভু বা উদ্যানে পুষ্পরাজি হয় বিকশিত। জীবনের বহু তথা থাকেও অজ্ঞাত ঘটনাপ্রবাহ নিত্য টানে পরম্পরা ঘটনার স্রোতে কে কাহাকে দেখে। সকলের লক্ষ্য কিন্তু এক বাসুদেব। যিনি সর্বভূতে সমভাবে চির অধিষ্ঠিত। তাহা জানে কয়জন। সদ্গুরুর উপদেশ শ্রাবণের বারিধারাপ্রায়; বৃষ্টি হয় সর্বক্ষেত্রে। পর্বতে মরুক্ষেত্রে উষর ভূমিতে। তত্রতঃ সার্থক তাহা হয় ভূক্ষেত্রগুণে।

ঘটনা পরম্পরা অজ্ঞাত নহে—মহাপুরুষসান্নিধ্যে এক দিন দুর্লভ ছিল না। কাল তাহার সাক্ষী আজ। কৃপাজলে অভিষিক্ত যে মহাপুরুষ নির্ভীক পরম আত্মা—স্বয়ং সত্যরূপ—চিদানন্দরূপ। আজ তাহা প্রত্যক্ষ সবার।

মালাকার ভাগ্যবান্। নানাভাবে তার পরিচয় কুসুম-কলির সাথে কি বিচিত্র রূপ ধরে—সজ্জিত মালাটি। দর্পণেও যদি পড়ে প্রতিবিম্ব তার। তাহাও মধুর। সুষমা লালিত্য যত সৌরভে বিলায়, নহে সীমিত কভু—অর্চনার উপচার। প্রতি পুষ্পে রূপের মাধুরী। তৃপ্ত মনঃ। তবুও অতৃপ্ত কেন? ছোটে দৃষ্টি পুষ্পান্তরে। জীবনমাধুর্য যায় সুখে দুঃখে সমপ্রায়ঃ। প্রতিঘাত বারে বারে টলাইতে কভু। জীবনসংগ্রামে জয়ী সে নিত্যপুরুষ। তাহার জীবনব্যাপী সাধনার কত শত বিন্দু। আজ তাহা মহোদধি। পূর্বকায় আত্মকায় যিনি। তাঁহার অসাধ্য কি বা ত্রিভুবনে আছে। মহাগুরু সৃজিলেন যারে তিনি আজ কঠোর কলির প্রতিঘাতে যথার্থতঃ পূর্ণানন্দ মহাগুরু। যাহারে পরিলে আর থাকে না বাসনা—তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ নরনারায়ণ। বাসুদেব কুসুমের অধীশ্বর

এই পুষ্পডালি দেখিবার অধিকারী যে বা, সে দেখিবে জীবনদর্পণে। ধন্য মালাকার। কত সাধনার সিদ্ধি ছিল গো তোমার। তা না হলে এভাবে কি যথাস্থানে যথাযোগ্য পুষ্প দিয়া মালা গাঁথা হোতো? এই যে মানসী বৃত্তি ভক্তি দিয়ে গড়া—কে পাইত তাহার সন্ধান? যদি না থাকিত দিব্যজ্ঞান। মুনের পুতুল যথা সমুদ্রেতে মিলে যায়—সত্তা হারাইয়া একত্বেতে হয় লীন। তথা তথা বাসনা—আসক্তি মুক্ত জীব ধরা শিবে পরিণত। "স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব" বলিতে পারিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের এক সাক্ষাৎ শিষ্য আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণই না কত লীলার অভিনয় করিলেন নরকাসুর তাঁহাকে বিত্তাড়িত করিল। ভীত সন্ত্রস্ত আদিপুরুষ গোবিন্দও কামরূপে পলায়নলীলার নাটক রচনা করিলেন। "যস্মিন্ তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং"—কে তাহার সন্ধান দাবিতে সমর্থ হয়। "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" মহাজন ও গুরুবেষধারী পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। তাই একান্ততঃ অদ্বৈত বা দ্বৈত যথার্থ সন্ধান দিতে পারে না—চাই তত্ত্ব দ্বৈতাদ্বৈত। "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ" ইহাও যদি সত্য হয় তবে একজন খাদ্য পিপাসা ভোজন করিবে একজন তাহার দ্রষ্টা থাকিবে তাহাই বা সত্য হইবে না কেন? "কস্তত্ত্বং বা কুত আয়াতঃ—তত্ত্বং চিন্তয় তদ্দিনং ভ্রাতঃ?" তত্ত্ব চিন্তা তত্ত্বমসি চিন্তা একই কথা। তৎ ত্বংও যেমন তত্ত্বং

শব্দের বাচক হয় সত্তা তথা তত্ত্ব শব্দের বাচক হয় অখিলগুণাধার অথচ নির্গুণ অখিল নাম ও রূপের অধিষ্ঠান ও কল্পিত নয়—"অধিষ্ঠানাবশেষো যো নামঃ কল্পিতবস্তুনঃ"

দর্পণে যে জীবন প্রতিবিম্বিত সেই প্রতিবিম্ব দর্শনে কি চিত্ত সরল হইবে না? ব্যাকুলতা যদি কাহারও থাকে যদি দীপ্তশিখা: হয় তবেই জলরাশির সন্ধান। তবেই সদ্গুরুর সন্ধান। তখনই আসে তত্ত্বজ্ঞানলাভের সাধনরূপে প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবা। তখন নামিয়া আসে দিব্যলোক হইতে জ্ঞানধারা। তত্ত্বদর্শীর সাধনালব্ধ অমৃতধারা জ্যোতি: রস ও অমৃত। জ্যোতি: দর্শনে চক্ষু যদি হয় প্রতিঘাত হল না সাধনা। অতিক্রম কর তাহা সাধনার বলে। বসেতে থেকো না মজে—পাইবে না অমৃতের দিবা আস্বাদন। চারাগাছকে কণ্টকশাখার আবরণ রাখিতে হয়। কণ্টক শাখার আবরণ ও লক্ষ্য নহে। সহস্র সহস্র বাধাবিপত্তিতে অবিচলিত থাকা কি একটুখানি কথা? তাই চাই সদ্গুরু-তরুরাজির শীতল ছায়ায় উপদেশ সমীরণ নিষেবন। ধন্য হও ধন্য হউক গুরুগত প্রাণ। মূলত যাহার কাছে স্বয়ং ভগবান্ "হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ! কিমদ্ভুতং হৃদয়াদ্ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে।" এই উক্তি উচ্চারণের সামর্থ্য হউক। ইহাই প্রার্থনা। ইতি—

শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ রায়

Principal
Sri Sri Jagannath Asram
Sanskrit Mahavidyalaya
P. O. Tarakeshwar, Dist Hooghly

নিম্বার্ক ব্রতোৎসব নির্ণয়

সন ১৩৮৩, বাংলা, শ্রাবণ মাস—৩২ দিন

৭ শ্রাবণ, ২৩ জুলাই, শুক্রবার, একাদশীর ব্রত ও উপবাস।

১৩ শ্রাবণ, ২৯শে জুলাই, বৃহস্পতিবার, শুক্লা তৃতীয়া শ্রীবল্লভাচার্য্যজীর আবির্ভাব তিথি আজ হইতে শ্রীবৃন্দাবনে ঝুলন উৎসব আরম্ভ।

১৭ শ্রাবণ, ২ আগষ্ট, সোমবার, শুক্লা সপ্তমী, শ্রীগোপীনাথ ভট্টাচার্য্যজীর আবির্ভাব তিথি।

২১ শ্রাবণ, ৬ আগষ্ট, শুক্রবার, একাদশীর ব্রত ও উপবাস।

আজ হইতে শ্রীবৃন্দাবনে ও স্বগৃহে কাঠিয়া বাবার আশ্রমে ঝুলন উৎসব আরম্ভ।

২৪ শ্রাবণ, ৯ আগষ্ট, সোমবার, চতুর্দ্দশী প্রাতঃ ঘ: ৩।১৭।১২ পর্য্যন্ত, পরে পূর্ণিমা রাত্রিশেষ ঘ: ৪।৫১।৪৯ পর্য্যন্ত। শ্রাবণী পূর্ণিমা ও ঝুলন পূর্ণিমা। অভিষেক ও অধিবাসন কর্ত্তব্য। আজ ঝুলন উৎসব সমাপন।

ভাদ্র মাস—১৩৮৩, বাংলা, ৩১ দিন

১লা ভাদ্র, ১৮ আগষ্ট, বুধবার, কৃষ্ণা অষ্টমী। শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রত ও উপবাস।

৪ ভাদ্র, ২১শে আগষ্ট, শনিবার, একাদশীর ব্রত ও উপবাস। আজ প্রাতঃকালে মথুরা হইতে ব্রজবিদেহী মহন্তের ব্রজচৌরাশী ক্রোশ বনপরিক্রমা আরম্ভ।

১৩ই ভাদ্র, ২ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার, নবমী। শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ব্রত ও উপবাস। পূর্ব্বদিন বিদ্ধা হওয়ায় আজ ব্রত হইবে।

১৮ই ভাদ্র, ৭ সেপ্টেম্বর, শনিবার, একাদশীর ব্রত ও উপবাস: পার্শ্বৈকাদশী: শ্রীগোপালাচার্য্যজীর আবির্ভাব তিথি।

১৯ ভাদ্র, ৪ সেপ্টেম্বর, রবিবার, শুক্লা দ্বাদশী। বামন দ্বাদশীর ব্রত ও উপবাস। শ্রীশ্রীবামনদেবের অর্চ্চনা কর্ত্তব্য। শ্রীকেশবাচার্য্যজীর আবির্ভাব তিথি।

সাময়িকী

গুরুপূর্ণিমা—

আগামী ২৭শে আষাঢ়, ১১ই জুলাই, রবিবার গুরু-পূর্ণিমা। শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ তাঁহার ভ্রমণসূচী অনুযায়ী ভ্রমণ শেষ করিয়া গত ২২শে জুন কাঠিয়া বাবার আশ্রম সুখচরে আসিয়া তথায় অবস্থান করিতেছেন। এই বৎসর গুরুপূর্ণিমা উৎসব শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের উপস্থিতিতে কাঠিয়া বাবার আশ্রম, সুখচরে যথাবিহিত সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইবে। সকল গুরু ভ্রাতাভগিনী ও বাবাজী মহারাজের ভক্তগণ এই উৎসবে যোগদান করিলে বিশেষ আনন্দের বিষয় হইবে। উৎসবের ব্যয়ের জন্য যিনি প্রীতির সহিত সাধ্যমত যে অর্থ সাহায্য করিবেন তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। এই অর্থ সাহায্য মহন্ত শ্রীশ্যামসুন্দরদাসজীর নামে কাঠিয়া বাবার আশ্রম, পোঃ সুখচর, ২৪ পরগণা এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

অক্ষয় তৃতীয়া—

গত ১৯শে বৈশাখ, অক্ষয়তৃতীয়ায় সুখচর কাঠিয়া বাবার আশ্রমে শ্রীশ্রীরাধারমণবিহারীজীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এইদিন দলে দলে ভক্তপ্রাণ নর-নারী শ্রীজীর চরণ দর্শন করেন। বেলা ১০টায় আশ্রমের নাট মন্দিরে সমবেত ভক্ত প্রাণ নর-নারী ও গুরু ভাইবোনদের উপস্থিতিতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন গুরুভ্রাতা শ্রীবীরেন্দ্র কুমার রায়। ইহার পর মধ্যাহ্নে শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসর সংযোগে বাদ্যধ্বনির মধ্যে মহন্ত শ্রীশ্যামসুন্দর দাসজী শ্রীবিগ্রহের আরতি করেন। প্রায় দুই শ্রীশ্রীজীমহাজীর প্রসাদ গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হন।

ধন্যবাদ

গত ৭ই জুন ১৯৭৬ সুখচরস্থ "কাঠিয়া বাবার আশ্রম"-এ শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী সন্তদাস কাঠিয়া বাবা দাদাগুরুজী মহারাজের শুভ আবির্ভাব তিথি উৎসব মাধ্যমে পালিত হয়। শ্রীশ্রীযুগলসরকারকে অতি শোভন ও মনোরম সাজে সজ্জিত করিয়া যথারীতি অরেত্রিক, পূজা, বন্দনা ও ভোগ-রাগাদি করা হয়। নিজ শ্রীমঞ্চে পরমানন্দে লীন প্রিয় সন্তানের শুভাবির্ভাব স্মরণেই যেন শ্রীশ্রীযুগলসরকার অতি অভিরাম শ্রীমণ্ডিত সিংহাসনে বেদীপরে বিরাজ করিতে-ছিলেন। আশ্রম পার্শ্বেই প্রবাহিতা কলনাদিনী কলুষহরা গঙ্গাও যেন আনন্দে স্ফীতা হইয়া আশ্রম প্রত্যন্তদেশ স্পর্শ করিয়া স্বীয় আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতেছিলেন।

সমবেত প্রায় ২ শত শিষ্যশিষ্যাভক্তগণকে গুরুভ্রাতা শ্রীবীরেন্দ্র রায় দাদাগুরুজীর পূতজীবনের অংশ বিশেষের স্মৃতিচারণ করিয়া শুনাইয়া কৃতার্থ করেন। গুরুভ্রাতা শ্রীব্রত সেনগুপ্ত শ্রীগুরু হইতে লব্ধ পরামন্ত্র গৃহীদের নিত্য গাইয়া জীবনে প্রতিফলন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেন। উৎসবান্তে উপস্থিত সকলকে খিচুড়ী, তরকারি ও মিষ্টপ্রসাদ বিতরিত হয়। আশ্রম মহন্ত শ্রীশ্যামসুন্দরদাসজীর নিজ তত্ত্বাবধানে অহরহ বাবাধামে উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি—

বাসুদেব পত্রিকার সমস্ত গ্রাহক, পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাঁহারা যেন পত্রিকা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের পত্রালাপ কার্য্যাধ্যক্ষ, বাসুদেব পত্রিকা, কাঠিয়া বাবার আশ্রম, পোঃ সুখচর জেলা—২৪ পরগণা এই ঠিকানায় করিবেন। কার্যাধ্যক্ষের বাড়ীর ঠিকানায় কোনরূপ পত্রালাপ করিবেন না।

—(শ্রীবীরেন্দ্রকুমার রায়, কার্য্যাধ্যক্ষ, বাসুদেব পত্রিকা)

আগরতলা সংবাদ

গুরুভ্রাতা শ্রীসুধাময় ভট্টাচার্য্য আগরতলা হইতে

জানাইয়াছেন যে গত ২৩।১১।৭৫ তারিখে শ্রীশ্রীগুরুদেবের অনুমতি ও অনুমোদনক্রমে নগীছড়া আশ্রমের যাবতীয় পরিচালনার জন্য "শ্রীশ্রীকাটিয়া বাবার আশ্রম সেবা কমিটি, নগীছড়া জে ত্রিপুরা" নামে একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে।

দুঃখের বিষয় কমিটি গঠনের কিছুকাল পর উহার সভাপতি শ্রীনরেশ চন্দ্র দাস গত ১।৩।৭৬ তারিখে শ্রীগুরু চরণে লীন হইয়াছেন। এতৎ প্রসঙ্গে গুরুভ্রাতা শ্রীরাজমোহন দাশ মহাশয়ের গৃহে গত ১০।৩।৭৬ তারিখে একটি স্মারক শোক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং শ্রীগুরুদেবের অনুমতি সাপেক্ষে নগীছড়া আশ্রমে তাঁহার নামে একটি স্মৃতিফলক বসাইবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

নগীছড়া আশ্রম সেবা কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীবিমল কান্তি রায় জানাইয়াছেন যে গত ৮।৪।৭৬ তারিখে গুরুভ্রাতা শ্রীমনিন্দ্র ওলাপাত্র মহাশয়ের বাসভবনে কমিটির এক বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীশ্রীগুরুদেবের ইচ্ছাক্রমে আশ্রম পরিচালনার সকল কার্য্যভার কমিটিই গ্রহণ করিয়াছেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গুরুভ্রাতা শ্রীসুধাময় ভট্টাচার্য্য উপরোক্ত কমিটির সভাপতির কার্য্যভার গ্রহণ করেন। কিছুকাল সুচারুরূপে তাঁহার দায়ীত্ব সম্পাদনের পর তাঁহার ও অন্যান্য সকল গুরুভ্রাতা ও ভগিনীর ইচ্ছাক্রমে গুরুভগিনী শ্রীমতি নীলিমা চৌধুরী মহাশয়া সভাপতির পদে বৃতা হইয়াছেন।

গত ২।৫।৭৬ তারিখে গুরুভগিনী শ্রীমতি শেফালী দেব বর্ম্মণের চৌমুহনী স্থিত বাসভবনে শ্রীশ্রীঠাকুরজীর মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে সাড়ম্বরে এক সাড়ম্বর উৎসব ও নগীছড়া আশ্রম সেবা কমিটির পরিচালনায় গত ১৩।৫।৭৬ তারিখে গুরুভ্রাতা শ্রীনচীন্দ্রলাল ঘোষক মহাশয়ের বাস ভবনে এক মনোজ্ঞ প্রীতিসম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়।

• • •

বাং ১৩৮২ সালের বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা বাসুদেব পত্রিকায় জানান হইয়াছিল যে ২৩শে মার্চ্চ, ১৯৭৫ শিলিগুড়ি বেতার কেন্দ্র হইতে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের শ্রীবিদ্যাচার্য্যের বৈতাবৈত সিদ্ধান্ত বিষয়ে এক ভাষণ প্রচারিত হইয়াছিল, যাহার সংক্ষিপ্তসার ঐ সংখ্যায় প্রকাশ করা হইয়াছিল। সম্পূর্ণ ভাষণটি তাঁহার ফটো সহ গত ২২।৫।৭৬ তারিখের "বেতার জগৎ"এ প্রকাশিত হইয়াছে।

পরলোকে ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে গত ১২ই জুন, ৭৬, বারাণসীতে বিশ্ব সাধক মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় দেহরক্ষা করিয়াছেন। কি জ্ঞানে, কি পাণ্ডিত্যে, কি সাধনায়ন অধ্যাত্মশক্তিতে— পরাবিদ্যাভূষণ এই মহাপণ্ডিত ও মহাসাধক শুধু ভারতে নয়, ভারতের বাহিরেও প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বিশ্বের যে ক্ষতি হইল, তাহা অপূরণীয়। ভারত সরকার তাঁহাকে পদ্মভূষণ উপাধিতে ও উত্তরপ্রদেশ সরকার সাহিত্য বাচস্পতি উপাধিতে সম্মানিত করেন।

শ্রীশ্রীঅন্নদাদেবী মাতৃ-আশ্রম, বারাণসী

শ্রীশ্রীঅন্নদাদেবী মাতৃ আশ্রম, বি৩।১৮১ শিবালা, বারাণসী-১ হইতে ভক্ত ও অনুরক্তদের প্রতি শ্রীমাদেবী জানাইতেছেন—

"আগামী ২৯শে শ্রাবণ সোমবার (১ই আগষ্ট '৭৬) পূর্ণিমা আমার পরমারাধ্যতমা গুরুমাতাঠাকুরাণী শ্রীশ্রী১০৮ শ্রীশ্রীঅন্নদামাতাজীর ত্রয়োদশাধিক শততম শুভাবির্ভাব তিথি এবং ১০ই ভাদ্র শনিবার তাঁহার শুভাবির্ভাব দিবস।

শ্রীশ্রীমাতাজীর প্রসন্নতা কামনায় ২৪শে শ্রাবণ হইতে ১০ই ভাদ্র পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমাতাজীর বিশেষ পূজাদি ও যথাসম্ভব সাধু, সন্ন্যাসী, যতী, ব্রাহ্মণ, ভক্তজন সেবা, সধবা কুমারী পূজা, দরিদ্র নারায়ণ সেবা এবং পাঠ কীর্ত্তনাদির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের শুভাবির্ভাব উৎসব প্রতিপালিত হইবে।

স্বধর্ম্মপরায়ণ ভক্তজনের নিকট বিনীত প্রার্থনা, সবান্ধবে এই পুণ্যানুষ্ঠানে যোগদান করিয়া উৎসবকে সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিবেন। পরিচিত ভক্তজন এবং পূজ্যতম শ্রীগুরুদেবের শিষ্যপ্রশিষ্যগণকে এই সংবাদ অবগত দিবেন।"

Swami Santadas Nimbarka Darsan Samity
NOTICE

Of the Third Annual General Meeting.

The third annual general meeting of the Swami Santadas Nimbarka Darsan Samity shall be held on 25th July, 1976 at 4 P.M. at the Registered office of the SAMITI at KATHIA BABAR ASRAM P. O. Sukhchar District 24 parganas in Pursuance of Regulation 5(a) (c) of the Regulations of the Samiti to transact the business specified below.

Consideration of—

Annual report of the Governing Body on the working of the Samiti for 1975-76.

Copy of the balance sheet and the auditor's report to be placed before the meeting by the General Secretary.

Such other business as may be brought up for discussion (Provided seven days notice thereof be given in writing to the General Secretary)

There shall be no election as the term of the office of the members of the Governing Body including the officers shall be three years according to the Regulations 1 (c) of the Samiti. The last election was held in 1974.

Sd. J. N. Bose
31.5.76
General Secretary.

বিশেষ আবেদন

শ্রীশ্রীগুরুদেবের নির্দেশে আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, শ্রীশ্রীগুরুদেবের জন্মস্থান বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ভড়া গ্রামে একটি মহাবিদ্যালয় (Degree College) স্থাপনের জন্য গ্রামবাসীগণ সরকার বাহাদুরকে মনুরোধ আবেদন করিয়াছেন। বাঁকুড়া জেলার কলেজ ইন্‌সপেক্টর এতৎ উদ্দেশ্যে ভড়া গ্রামে আসিয়া স্থান পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

গ্রামবাসীগণ এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় জমি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং কিছু অর্থও সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু এই মহৎ কাজে বহু অর্থের প্রয়োজন।

গুরুভ্রাতা-ভগিনীগণের নিকট আবেদন, তাঁহারা যেন মুক্তহস্তে যথাসাধ্য দান করিয়া এই মহৎ উদ্দেশ্যকে জয়যুক্ত করেন।

সরকারের নির্দেশে অন্ততঃ আরো ১৫০০০৲ টাকা কলেজ বিল্‌ডিং তহবিলে জমা দেখাইতে হইবে ও সত্বর গৃহ-নির্মাণ কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের শ্রীশ্রীগুরুদেবের নামানুসারে এই মহাবিদ্যালয়ের "শ্রীশ্রীঘনশ্যামদাস কাঠিয়াবাবা মহাবিদ্যালয়" নামকরণ হইবে।

অর্থ পাঠাইবার ঠিকানা :—
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, ১৩-১এ, ঘুগীপাড়া রোড, কলিকাতা-৬

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু
সেক্রেটারী, কাঠিয়াবাবার আশ্রম।

REVISED-2009

কাঠিয়া বাবার আশ্রম সুন্দরবন হইতে প্রকাশিত গ্রন্থরাজি
ব্রহ্মবিদ্বেষী মঠস্থ ও চতুঃসম্প্রদায়ের শ্রীমঠস্থ শ্রী১০৮ স্বামী মনহরদাসজী কাঠিয়া বাবা
প্রণীত ও সম্পাদিত আধ্যাত্মসাধনার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ

শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবদের আচারাদর্শ ও তাঁহাদের উপদেশাবলী প্রথমখণ্ড—
শ্রীবৈষ্ণবকুলচন্দ্র ও তাঁহার উপদেশাবলী প্রথম খণ্ড
শ্রীগুরুকুলচন্দ্র মুকুন্দদাস ও তাঁহাদের উপদেশাবলী দ্বিতীয় খণ্ড
শ্রীশ্রীদেবী মাতৃকা ও তাঁহার উপদেশাবলী (দুই ভাগে)—তৃতীয় খণ্ড পূর্বভাগ ১৫০০ উত্তরভাগ ১০০
শ্রীবিষ্ণুকাঠিয়া, তাঁহার ধর্মমত ও সাধন প্রণালী (দুই ভাগে)—চতুর্থ খণ্ড
১ম ভাগ ৮০০ ২য় ভাগ ১৫০ ৪র্থ ভাগ ১৫
শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও তৎপরবর্তী আচার্যগণ (দুই ভাগে)—পঞ্চমখণ্ড পূর্বভাগ—১২০০ উত্তরভাগ ১০০
শ্রীনিমাই-পন্থতি (তৃতীয় সংস্করণ)
বেদান্তকামধেনু (সংস্কৃতী)—তৃতীয় সংস্করণ ও টীকাসহ
নিমাই সন্ন্যাস ও সংক্ষিপ্ত সার (হিন্দী) (উনবং প্রেম সরকার কর্তৃক পুনরুদ্ধার)
১৫০/৩৫০
ব্রহ্মবিদ্বেষী মঠস্থ তথা চতুঃসম্প্রদায়ের শ্রীমঠস্থ শ্রী১০৮ শ্রীরামদাস কাঠিয়াবাবাজী মহারাজজী
জীবনচরিত (হিন্দী)—(শ্রীমতী পার্বতী নারায়ণ কর্তৃক প্রকাশিত)
ব্রহ্মবিদ্বেষী মঠস্থ শ্রী১০৮ স্বামী মনহরদাস মহারাজের জীবনী ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড একত্রে ৫০০ ৪র্থ খণ্ড ৪০০
পত্রাবলী :—ব্রহ্মবিদ্বেষী মঠস্থ ও চতুঃসম্প্রদায়ের শ্রীমঠস্থ শ্রী১০৮ স্বামী মনহরদাসজী কাঠিয়া বাবা
মনহরদাস কর্তৃক লিখিত (৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ) ১ম খণ্ড ৩৫০ ২য় খণ্ড ৩৫০ ৩য় খণ্ড ৩০
শ্রীকেশবকাশ্মীরিভট্টজী মহারাজ
শ্রীবৃন্দাবনধামাধ্যক্ষ ও ব্রজবিদ্বেষী
অষ্টযামসেবাকথা
করুণাসাগরবৎসল শ্রীভগবান
বাহ্য ও মানস জীবনে বৈরাগ্যের ও বিবাহের প্রয়োজনীয়তা
ভক্তপুণিয়া
শ্রীশ্রীমনহরদাস উপদেশামৃত—(সঙ্কলক ও প্রকাশক শ্রীললিতকুমার বসু
শ্রীশ্রীমনহরদাস পত্রামৃত—(সঙ্কলক ও প্রকাশক শ্রীললিতকুমার বসু)

আরও যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে :—
১। চিত্রাবলী। ব্রহ্মবিদ্বেষী মঠস্থ ও চতুঃসম্প্রদায়ের শ্রীমঠস্থ শ্রী১০৮ স্বামী মনহরদাসজী কাঠিয়া বাবার সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য ও তাঁহার বাণীর প্রায় দুইশত চিত্রে এ্যালবাম (সঙ্কলক ও প্রকাশক শ্রীললিতকুমার বসু)
শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের জীবনদর্শন—শ্রীললিতকুমার বসু
: অমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য, এম. এ, পি-এইচ. ডি, বেদান্তশাস্ত্রী, কাব্য-বেদান্ত বেদান্ত-তীর্থ কর্তৃক প্রণীত
ব্রহ্মবিদ্বেষী মঠস্থ ও চতুঃসম্প্রদায়ের শ্রীমঠস্থ শ্রী১০৮স্বামী মনহরদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত
প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে বোর্ডে বাঁধান—৩০০ প্লাষ্টিক কভারসহ ৮
শ্রীনিমার্ক ও বৈষ্ণবাচার্য দর্শন—
৪ সমীক্ষা পঞ্চক বা ভগবান কৃষ্ণের আবির্ভাবকাল ইত্যাদি বিষয়ক মতবাদের সমালোচনা ও বিচার—
৫ উপনিষৎ প্রবীপম্—
মৃগভূমিকায় স্বামী মনহরদাস—শ্রীরাধারমণ চৌধুরী
স্বামী মনহরদাস নিম্বার্কদর্শন সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত :—
১। স্বামী মনহরদাস জীবনালেখ্য—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম, এ
২। Guru Purnima (in English)—Translated by Br. Susil Kumar Roy.
৩। মহর্ষি মনহরদাস ও তাঁহার অনুবর্তী—শ্রীদেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য এম. এ
উপরোক্ত গ্রন্থ ভিন্ন স্বামী মনহরদাস নিম্বার্কদর্শন সমিতির মুখপত্র "ভাগবতদেব" পত্রিকাও বাহির হইতেছে, তাহা নমুনা কপি পাঠাইয়া থাকি—বার্ষিক মূল্য ৮০০ (টাকা)।

মাতৃ আশ্রম কাশী হইতে প্রকাশিত :—
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী দেবী—
শ্রীমদ্ভাগবতী, পরমতীর্থ, বেদান্তশাস্ত্রজ্ঞী—৪০০

প্রাপ্তিস্থান :—(১) কাঠিয়া বাবার আশ্রম, পোঃ সুখচর ২৪ পরগণা। (২) মডেল লাইব্রেরী, ২৩১ আমহার্স্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯

শ্রীললিতকুমার বসু কর্তৃক ১৯৫ কেশবক চিত্তরঞ্জন রোড বজবজ, (২৪ পরগণা) হইতে প্রকাশিত এবং ইণ্ডিয়ান ফিল্ম পি-১৯, সি, আই, টি রোড, কলিকাতা-১৪ হইতে মুদ্রিত